দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৩ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১।।
৯ ফাল্গুন - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।।
website : www.eswastika.com

একুশে: ভাষারি মাস না, হতাশার?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ৯ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২২ ফেব্রুয়ারি - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,
Website : www.eswastika.com

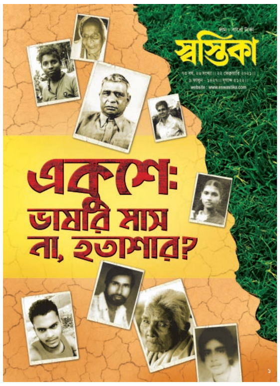

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

বিষবৃক্ষের ফলের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকেই নিতে হবে
□ বিশ্বামিত্র □ ৬

সুন্দর মৌলিকের চিঠি : খেলা হবে, তোর বাপকে গিয়ে বল □ ৭

রাজবংশী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন পদ্মশ্রী ধর্মেন্দ্রনারায়ণ বর্মা □ পার্থ বর্মা □ ৮

অমর একুশের মুখ ও মুখোশ □ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ১১

মুক্তিযুদ্ধে রক্ত দিলেও হিন্দু বাঙ্গালি এখনও কাফের
□ স্বর্ণাভ মিত্র □ ১৩

বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য □ বাসুদেব ধর □ ১৫

মায়ানমারের অভ্যুত্থানের পিছনে কি চীনের হাত?
□ ধীরেন দেবনাথ □ ১৯

বাংলাদেশি বাংলার দাপটে স্বকীয়তা হারাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা □ চন্দ্রিমা বন্দ্যোপাধ্যায় □ ২৩

বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভাষার ভূমিকা যৎসামান্য
□ মিতালি মুখার্জি □ ২৭

যুগদ্রষ্টা স্বামী প্রণবানন্দ ও বাঙ্গালি হিন্দু
□ বিজয় আঢ্য □ ৩১

জাতি গঠনের মন্ত্র জপ করতে শিখিয়েছেন স্বামী প্রণবানন্দ
□ অনীত রায়গুপ্ত □ ৩৩

জাতি রক্ষার্থে মাটি ভাগ হয়েছে, এবার ভাষা ভাগ হোক
□ সুমিত রায় □ ৩৫

বাংলাভাষার আরবিকরণের পাঁচটি ধাপ
□ স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী □ ৩৮

সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশের হাতিয়ার ছিল আর্যতত্ত্ব
□ দেবযানী হালদার □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য: ২২ □ সমাবেশ-সমাচার : ২৯-৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ চিত্রকথা : ৪২ □ শব্দরূপ : ৪৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১ মার্চ
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় এলে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে

ধরে নেওয়া যাক ২০২১-এর নির্বাচনে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি এবং দায়িত্ব নেওয়ার পরেই মুখোমুখি হয়েছে বেশ কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের। সেইসব চ্যালেঞ্জ কী ধরনের হতে পারে এবং তার প্রতিকারই বা কীভাবে পাওয়া যেতে পারে— স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে তারই পর্যালোচনা। লিখবেন সুকল্প চৌধুরী, রতন ঘোষাল প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani**
Kolkata-700 071

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দু বাঙ্গালির নিকট একুশের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নাই

মানুষের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হইল ভাষা। বাংলাভাষা পৃথিবীর সমৃদ্ধতম ভাষা। সংস্কৃতভাষা হইতে নানা বিবর্তনের স্তর পার হইয়া বাংলাভাষার উদ্ভব হইয়াছে। কবি অতুল প্রসাদ গাহিয়াছেন, 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলাভাষা'। বাংলাভাষা বাঙ্গালির প্রাণের ভাষা, বাঙ্গালির আত্মপরিচয়ের ভাষা। তাই কবি আবার বলিয়াছেন, ' তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা'। খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম পদসংকলন তথা সাহিত্য নিদর্শন। ইহার রচয়িতা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। সমকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলী পদগুলিতে পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার হইতে চর্যাপদের একটি খণ্ডিত পুঁথি উদ্ধার করেন। পরবর্তীকালে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চর্যাপদের সঙ্গে বাংলাভাষার অনস্বীকার্য যোগসূত্র বৈজ্ঞানিক ভাবে যুক্তি-সহ প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতীয় ভাষার জননীস্বরূপা সংস্কৃতভাষার জ্যেষ্ঠাকন্যা স্বরূপা বাংলাভাষা। কালে কালে সেই সংস্কৃত রূপান্তরের মধ্য দিয়া বাংলাভাষার আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এইগুলি হইল তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব। তৎসম হইল সরাসরি সংস্কৃত, অর্ধতৎসম হইল সংস্কৃত মিশ্রিত কথ্যরূপ এবং তদ্ভব হইল সংস্কৃত হইতে উদ্ভব আঞ্চলিক ভাষারূপ। এই বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম,মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী।

এইরূপ সমৃদ্ধতম বাংলাভাষা আজ তাহার স্বকীয়তা হারাইতে বসিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতেই বঙ্গপ্রদেশের মৌলভিরা বাংলাকে হিন্দুর ভাষা অথবা কুফুরি জবান অর্থাৎ কাফেরদের ভাষা বলিয়া ফতোয়া জারি করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বঙ্গপ্রদেশের মুসলমানরা বাংলাকে তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিত না। ফজলুল হকের মতো শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমানরাও উর্দু-আরবি ভাষাতেই কথা বলিতেন। বঙ্গপ্রদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানরা নিজেদের মূল অস্বীকার করিয়া পৃথক পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করে। তাহারা ক্রমাগত আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাংলাভাষাকে সংস্কৃত বর্জিত করিয়া ইসলামিকরণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা' প্রবন্ধে বাংলাভাষার ইসলামিকরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন, ' আজকের বাংলাভাষা যদি বাঙ্গালি মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্ট ও সহজভাবে প্রকাশ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহারা বাংলা পরিত্যাগ করিয়া উর্দু গ্রহণ করিতে পারেন। তাহা বাঙ্গালি জাতির পক্ষে যতই দুঃখকর হউক না কেন বাংলাভাষার মূল স্বরূপকে দুর্ব্যবহারের দ্বারা নিপীড়িত করিলে তাহা আরও বেশি শোচনীয় হইবে' (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪১, পৃঃ-১০৩-১০৪)। অন্য এক স্থনে বলিয়াছেন, 'আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হইয়া ওঠে তাহা হইলে ইহার অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করিবে।'

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন আসলে বাংলাভাষার প্রতি প্রেম নহে। তাহাদের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হইলে অর্থনৈতিক ভাবে তাহারা পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পিছাইয়া পড়িবে। আজ হিন্দু বাঙ্গালিদের বুঝিতে হইবে, ভাষা ও জাতিসত্তায় তাহারা এক নহে। বাংলাদেশে ভাষা-জেহাদের সঙ্গে চলিতেছে নিরন্তর হিন্দু নিধন। ১৯৪৭ সালে সমগ্র বঙ্গ ও অসমকে লইয়া 'ইসলামি বাংলা'র স্বপ্ন যাহারা দেখিয়াছিল, তাহার প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসদের নেতৃত্বে শুরু হইয়াছিল হিন্দু বাঙ্গালির নিজস্ব বাসভূমির আন্দোলন। ফলস্বরূপ আরব সাম্রাজ্যবাদের বুক চিরিয়া জন্ম হইয়াছে আজকের পশ্চিমবঙ্গ। আরব সাম্রাজ্যবাদীরা সেই আক্ষেপ ভুলিত পারে নাই। তাহারা ভোটব্যাঙ্ক ও ভাষা আগ্রাসনের মাধ্যমে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিতে উদ্যত। পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী 'জয় বাংলা' স্লোগানের মাধ্যমে হিন্দু বাঙ্গালিকে বিপথে চালিত করিয়া 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' গড়িবার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। হিন্দু বাঙ্গালিকে তাহাদের সেই স্বপ্নকে ধ্বংস করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষা দিবস নহে, পালন করিতে হইবে আরব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস। আরব সাম্রাজ্যবাদীদের পশ্চিমবঙ্গের দালালরা যতই একুশে লইয়া মাতামাতি করুক, হিন্দু বাঙ্গালির নিকট তাহার কোনো প্রাসঙ্গিকতা নাই।

সুভাষিতম্

জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ শূরো ব্রহ্মচারী সুপণ্ডিতঃ।
সত্যবাদী ভবেদ্ভক্তো দাতা ধীরহিতে রতঃ।।

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, শূর, ব্রহ্মচারী, সুপণ্ডিত, সত্যবাদী, দাতা ও ধৈর্যশীল এবং বুদ্ধিমান-পণ্ডিতদের হিতে রত, সেই ব্যক্তিকে ভক্ত বলা হয়।

বিষবৃক্ষের ফলের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকেই নিতে হবে

বিশ্বামিত্র

রাজ্য-রাজনীতিতে খুব বড়ো একটি বিষয় ঘটে গেছে। ১১ ফেব্রুয়ারি বাম ছাত্র-যুবদের ডাকা নবান্ন চলো অভিযানের সময় মইদুল ইসলাম মিদ্যা নামে এক যুবক গুরুতর আহত হয় এবং গত ১৫ তারিখ সে মারা যায়। এমনিতে পুরো বিষয়টিই খুব প্ল্যান-মাফিক এগোচ্ছিল এবং এখানে সম্ভবত একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। এক সাংবাদিক তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়ালে প্রশ্ন তুলেছেন, এই সময় হঠাৎ নবান্ন অভিযানের দরকার পড়ল কেন? ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করাও হয়ে গেছে। যে কোনো দিন রাজ্যের নির্বাচন ঘোষিত হবে। এখন মিটিং-মিছিল ইত্যাদি করে বিরোধীরা রাজ্য সরকারের কাজে খতিয়ান চাইবে। রাজ্যের শাসক দলও পালটা মিটিং-মিছিলে তাদের গত পাঁচ বছরের কাজের ফিরিস্তি দেবে। এটাই দস্তুর, এতদিন পর্যন্ত এটাই চলে এসেছে। রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক-ভবনে তখনই অভিযান হয়, যখন সামনে বিধানসভার নির্বাচন থাকে না, অর্থাৎ প্রশাসনের ন্যূনতম একটা স্থায়িত্ব থাকে। সুতরাং সময়ের বিচারে ১১ তারিখে বাম ছাত্র-যুবদের নবান্ন অভিযানের পাটীগণিত মিলছে না। তবে আন্দোলনের তাড়ায় বাচ্চা ছেলেপিলেরা পাটীগণিতের হিসেবে গণ্ডগোল করে ফেলেছে? ওদের অতটা কাঁচা ভাবাও ঠিক কাজ না। সব হিসেব-মাফিকই হয়েছে। আসলে এটা অন্য পাটীগণিত, জনগণকে বোকা বানানোর 'খেলা হবে' বলা যেতে পারে আর কী! তৃণমূলের দলনেত্রী দেওয়াল লিখন বিলকুল পড়তে পারেন, তিনি না পারলেও তাঁর ভাড়াটে ভোট-ম্যানেজার প্রশান্ত কিশোর তো অবশ্যই পেরেছেন।

রাজ্যে বিজেপির যা বাড়বাড়ন্ত, ভোটের সমীক্ষার যা ফল তাতে এবার তৃণমূলের বিদায় নিশ্চিত। এখন প্রশান্ত কিশোর বা মমতা ব্যানার্জি স্বয়ং অঙ্ক কষে দেখেছেন এই অবস্থা থেকে তাদের বাঁচাতে পারে একমাত্র বাম-কংগ্রেস। বাম-কংগ্রেসের যা হাল তাতে একক কৃতিত্বে ক্ষমতায় আসা আর এক লাফে চাঁদে যাওয়া একই ব্যাপার। সুতরাং তৃণমূলের লেজুড়বৃত্তি তাদের অবলম্বন করতেই হবে, রাজ্য রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকার জন্যও বটে, আবার কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে 'সাম্প্রদায়িকতা ঠেকানোর' বাগাড়ম্বরের জন্যও। আর তৃণমূলের ফয়দা বাম-কংগ্রেস যদি শাসক-বিরোধী ভোটের যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি ভোট বলা হয়, এর কিছু অংশ যদি বাম-কংগ্রেস যদি টেনে নিতে পারে তাহলে বিজেপি এককভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আসন পেলেও কোনোমতেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা অ্যাবসোলিউট মেজরিটি পাবে না। তখন মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, এনসিপি, কংগ্রেসের মতো এরাজ্যেও তৃণমূল-বাম- কংগ্রেসের একটা আঁতাত হয়ে বিজেপিকে ঠেকিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ঠেকানোর 'মহান' কর্মটি তারা করবে। এইজন্য ১১ তারিখ পুলিশের 'নির্মমতা'র এইরকম প্রেমের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল।

খাল কেটে কুমির ঢোকালে সে জলাশয়ের পোষা মাছদের ছেড়ে দেবে না, এটা মমতা ব্যানার্জি এবার হয়তো হাড়ে হাড়ে টের পাবেন। ...যে বিষবৃক্ষ তিনি পুঁতেছেন, তার ফলের দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মৃতকে এই অক্সিজেন দেওয়ায় মৃত আদৌ নড়েচড়ে উঠবে কিনা, বা শুধু সেই আলোচনাতেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলবে কিনা, সেটা পরের ব্যাপার। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারে এসে মোদী স্পষ্টভাষায় জানিয়েছিলেন, তলে তলে এই রাজ্যে তৃণমূল- সিপিএম- কংগ্রেসের জোট হয়েছে এবং এতে সুজনবাবুদের খুব গোঁসাও হয়; কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অনুমান যে কতবড়ো সত্যি সেটা ১১ ফেব্রুয়ারি ও তার পরদিন রাজ্যের মতদপুষ্ট সিপিএমের বনধে মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন।

এখন আপনি প্রশ্ন তুলতেই পারেন, মার যে খেয়েছে, মারা যে গেছে, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। বামেদের লোকেরা জেনেশুনে এই ঝুঁকি নেবেন কেন? এইবেলা আমাদের কলেজ-বেলায় ফিরতে হচ্ছে। বামেদের তখন ভরা আমল, পেলে হাতে মাথা কাটার অবস্থা। তখন কার্যকলাপে একটা স্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল— 'ছাত্র মেরে ছাত্র প্রেম, এরই নাম সিপিএম'। স্লোগানটির উৎস বলতে পারবো না, কিন্তু এর মর্মার্থ বোঝা যায় যে কোনও হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের কমরেডদের জান দিতে হলেও পার্টির কিস্যু যায় আসে না। কারণ 'সবার ওপরে পার্টি সত্য, তাহার উপরে নাই'। ভুললে চলবে না, এই 'লাশের রাজনীতি'র শুরুটা তৃণমূলকে দিয়ে হয়নি, হয়েছিল সিপিএমকে দিয়েই। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না।

সিপিএমের কিছু অতিরিক্ত লাভও হয়েছে। মৃত মইদুলের সম্প্রদায়গত পরিচয়কে হাতিয়ার করে সিপিএম তাদের পৈতৃক- সম্পত্তি বলে পরিচিত ভোটব্যাঙ্কটিকে পুনরুদ্ধারের এবার মরিয়া চেষ্টা করবে। সেই চেষ্টা যে শুরু হয়ে গেছে সেটা বোঝা যায় কংগ্রেসের পাশাপাশি আব্বাস সিদ্দিকী-আসাদুদ্দিন ওয়েসির সঙ্গে বামেদের আসন্ন বিধানসভায় আসন রফার আলোচনায়। তাই যদি হয়, তৃণমূলের ওপর কিন্তু চাপ বাড়বে। খাল কেটে কুমির ঢোকালে সে জলাশয়ের পোষা মাছদের ছেড়ে দেবে না, এটা মমতা ব্যানার্জি এবার হাড়ে হাড়ে টের পাবেন মনে হয়। গত লোকসভার ফলাফলের নিরিখে স্পষ্ট হিন্দুরাও কিন্তু তাদের অস্তিত্বরক্ষার তাগিদেই ভোটের বাক্সে এককাট্টা হচ্ছেন। কিন্তু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা এবার চূড়ান্ত আকার ধারণ করবে তাও বলা বাহুল্য। যে বিষবৃক্ষ তিনি পুঁতেছেন, তার ফলের দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে। তিনি কীভাবে এর মোকাবিলা করেন, সেটাই এখন দেখার। □

‘খেলা হবে, তোর বাপকে গিয়ে বল’

মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়,
যুবরাজ, পশ্চিমবঙ্গ
আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়

নেই। কোনওদিন কথাও হয়নি। তবে আপনাকে আমি চিনি। আমার দিদির ভাইপো হিসেবে চিনি। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হিসেবে চিনি। এখন অবশ্য আপনার ডায়লগের জন্যও চিনি। আর একটা কথা আছে যুবরাজ। আপনি সবার বিরুদ্ধে পান থেকে চুন খসলেই যে ভাবে মামলা করেন তাতে আপনাকে একটু ভয়ে ভয়েও চিনি। এই যে চিঠি লিখছি তাতেও অনেক ভয়।

সামনেই একুশে ফেব্রুয়ারি। অপনারা তো এটাকে ভাষা দিবস বলে মানেন। কিন্তু আপনি ইদানীং যে ধরনের ভাষা দেখাচ্ছেন তাতে কয়েকটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে। ‘যদি বাপের বেটা হই, ভোট শেষ হওয়ার আগে তোমাদের দিয়ে ‘জয় সিয়া রাম’ বলিয়ে ছাড়ব।’ এটা আপনারই বক্তব্য। তাও আবার জনসভায়। এগুলো আমরা কলতলার ঝগড়ায় অনেক শুনেছি। ‘বাপের ব্যাটা’, ‘এক বাপের ব্যাটা’, ‘মায়ের দুধ খেয়ে থাকলে’— এসব অনেক শুনেছি। আপনি সেই কলতলাকে রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে আসায় আমি আপ্লুত। আরও একটা ডায়লগ আমার হেব্বি লেগেছে।

আমার দিনটা মনে আছে। সেদিন কাঁথিতে শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ি ‘শান্তিকুঞ্জ’-র কয়েক কিলোমিটার দূরে তৃণমূলের বিশাল সভা থেকে গলার শিরা ফুলিয়ে বলছিলেন, ‘এমনিতে তো জোকারের মতো মুখ! তার উপর বড়ো বড়ো কথা! আমাকে বলছে যে, ‘এলে দেখে নেব। যদি না শোধরাও, ওই করব, তাই করব। আরে তোর বাপকে গিয়ে বল, তোর বাড়ির পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি! যা করার কর! আয়! হিম্মত আছে? এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার মাটিতে, তোমার পাড়ায় তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে যাচ্ছি।’ এরপর আপনি বলেন, ‘চার আনার নকুলদানা, তার আবার ক্যাশমেমো। আমাকে থ্রেট দিচ্ছে! আজকে এলাম। আগামী দু’মাসের মধ্যে আরও পঞ্চাশ বার আসব। জামানত বাজেয়াপ্ত করব।’ শেষটা ঠিকই বলেছেন। বারবার যান। জমানত বাজেয়াপ্ত করুন। কিন্তু একটা কথা যুবরাজ। এখনও পর্যন্ত শিশিরবাবু আপনার দলের সম্মাননীয় সাংসদ। সেটা ছেড়েও দিন, বয়সে অনেক বড়ো। তাঁকে অমনটা বলা কি ঠিক হয়েছে?

এটাও বলেছেন, ‘জোরে আওয়াজ তুলুন। পাঁচ কিলোমিটার দূরেই তো শান্তিকুঞ্জ। সেটা যেন থরথর করে কাঁপে।’ শুভেন্দু এবং তাঁর পরিবারকে ‘মিরজাফর অ্যান্ড কোম্পানি’ হিসেবে চিহ্নিত করে ‘মেদিনীপুর থেকে বিতাড়িত’ করারও আহ্বান জানান আপনি। সেই সঙ্গেই বলেন, ‘বাড়িতে বয়স্ক লোক রয়েছে। মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে। আমি চাই না কোনও অঘটন ঘটুক।’ এটার মানে কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। না, ঠিক করেননি।

‘আমার তোলাবাজির প্রমাণ দিতে পারলে আমি বলব, আমাকে দাঁড় করিয়ে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে চলো।’ যুবরাজ আপনার এই ডায়লগটা কিন্তু আমার দারুণ লেগেছে। তবে আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনি সাংসদ মানুষ। আইনকানুন ভালোই জানেন। কিন্তু এভাবে আত্মহত্যার কথা বলাটা কি আইনত?

তবে যুবরাজ আপনি হেরে গেছেন কেষ্টদার কাছে। উনি ‘খেলা হবে, ভয়ংকর খেলা হবে’ বলে যে হুমকি দিয়ে রেখেছেন সেটাই এবারের হিট ডায়লগ। কিন্তু কেমন সে খেলা? বাঙ্গলা আগে দেখেছে কি? ▯

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৮ মার্চ স্বস্তিকা বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। বিষয়— ‘পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে’।

এই সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যাটি সম্পূর্ণ রঙিন তো হবেই, সঙ্গে থাকবে অতিরিক্ত পৃষ্ঠাও। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

প্রচার প্রতিনিধিরা তাঁদের প্রয়োজনীয় কপির সংখ্যা সত্বর জানান, যাতে সেই মতো পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হয়।

—স্বঃ সঃ

রাজবংশী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন পদ্মশ্রী ধর্মেন্দ্রনারায়ণ বর্মা

পার্থ বর্মা

শ্রীযুক্ত ধর্মনারায়ণ বর্মা ১৯৩৫ সালের ১০ নভেম্বর তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষের মধ্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেশীয় রাজ্য কুচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রাম বারোকোদালীতে জন্মগ্রহণ করেন জন্মাষ্টমীর পরের একাদশী তিথিতে। বাবা দেবেশ্বর বর্মা এবং মা মান্দল দেবী। যে বয়সে বাবার ঘাড়ে, পিঠে চড়ে আবদারে কাটানোর কথা, সেই ছোটোবেলাতেই ছয় বছর বয়সে, বিধাতার নির্মম পরিহাসে বাবাকে হারিয়ে ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় মাস্টারমশাই। বাল্যকালে গ্রামের স্কুলেই তাঁর পড়াশোনা শুরু। তারপর তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে মেট্রিকুলেশন পাশ করে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আইএ, বিএ পাশ করে ১৯৫৭ সালে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন। ১৯৫৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে থাকতেন। ডক্টর সুনীতি চ্যাটার্জি ও সুকুমার সেনের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তারপর সেখানেই তিনি কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (মেইন)-এ সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু মায়ের অসুস্থতার কারণে শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি তুফানগঞ্জে ফিরে এসে শৈশবের প্রিয় তুফানগঞ্জ এন এন এম উচ্চতর বিদ্যালয়েই সহকারী শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং সেখাই থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে উনি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন সাহিত্যচর্চায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের যে বিশাল সমাজ রয়েছে, সেই রাজবংশী সমাজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং নিজের মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর সাহিত্য সাধনা। শুধু তাই নয়, তিনি সর্বদাই রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার পথকে অনুসরণ করেন। বহু বিচার-বিশ্লেষণ করে রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা এই অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষার নাম বলেছিলেন কামতা বেহারী। মাস্টারমশাই ১৯৯০ সালে লিখলেন, 'A step to kamata behari language'। বইটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে দিয়েছিলেন। শুরু হয়ে গেল বিতর্ক। সাহিত্য সাধনার জগতে কতিপয় তথাকথিত স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীর রোষানল, ব্যঙ্গবিদ্রূপ তাঁর প্রাপ্য ছিল নিয়মিতভাবে। কিন্তু সাহিত্য সেবার প্রতি, নিজের মাতৃভাষার প্রতি নিজের কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি তার যে গভীর প্রেম, ভালোবাসা— তাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারেনি শত আঘাতেও। তাই তিনি তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মাতৃভাষাকে জগৎ সভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করাতে হবে। আগামী প্রজন্মের কাছে এ ভাষা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি হাজার হাজার বছরের রাজবংশী সমাজের যে ইতিহাস, তা গবেষণার মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে আনলেন। প্রকাশ করতে থাকলেন 'কামরূপ কামতা কুচবিহার রাজ্যের ইতিহাস (বর্মা ও মান্তা)'। 'কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা'। কামতা বিহারী ভাষার ব্যাকরণ (প্রথম পাঠ) এর প্রথম পাঠ। কামতাপুরী ভাষা প্রসঙ্গ।'

'আই ভাষা কামতাপুরী ও ভাষা কমিশন ২০১১'।

চর্যাপদ— কামরুপি মৈথিলী ভাষাৎ বৌদ্ধ সহজিয়া গান।'

তিনি কামতাপুরী ভাষার লিপি নিয়েও পর্যালোচনা করছেন।

এই অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ক্ষত্রিয় রাজবংশীর জাতিতত্ত্ব নিয়ে সময়ে অসময়ে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে সেই সমস্যা মোকাবিলা করতে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু কালের গতিতে এই একই বিষয় নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতেও নতুন করে রাজবংশী

ক্ষত্রিয়দের বিভ্রাটে পড়তে হচ্ছে। সেই বিষয়ের উপরেও মাস্টারমশাইয়ের প্রচুর প্রবন্ধ আছে। এই উদ্দেশ্যে তার একটি বই 'একটা পুছারি রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ আগত হাটিবে না পাচ্ছিলা ভিতি ঘাটা করাইবে'। এছাড়াও 'পরমার্থপথে জিজ্ঞাসা' 'পরমার্থতত্ত্ব'।

তার ঐতিহাসিক উপন্যাস— 'মহারাজ নর নারায়ণ', 'মহারাজ চিলারায়', 'মহারাজ নীলাম্বর' মাস্টারমশাইয়ের সাহিত্য সাধনার কথা প্রথম আমি জানতে পারি তার মুখ থেকেই। উনি মহাবিদ্যালয়ে পড়ার সময় কলেজে যে ম্যাগাজিন বের হতো সেখানেই প্রথম লিখতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে পরিসর পরিধি বাড়তে থাকে, তৎসঙ্গে অন্তরের অদম্য বাসনাকে প্রতিফলিত করতে গিয়ে তিনি বহু সাহিত্য রচনা করলেন। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিশায় সাহিত্য জগতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। নিয়মিতভাবে মাতৃভাষা তথা কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রচার প্রসারের জন্য 'রায়ডাক' নামে একটি পত্রিকা ১৯৭২ সাল থেকে তিনি বের করলেন। সহযোগী ছিলেন তাঁরই ছাত্র শরৎ চন্দ্র বর্মা। পরবর্তীতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে কিছুদিন রায়ডাক পত্রিকা অনমিয়মিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে তাঁর আর এক সুযোগ্য ছাত্র ক্ষিতিন্দ্র মোহন সরকার রায়ডাক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে চলেছেন। উপদেষ্টা মাস্টারমশাই।

সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি তিনি দেখলেন অবিভক্ত ভারতের বা পরাধীন ভারতবর্ষের করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহারের ইতিহাস পৃথিবীর বুকে উজ্জ্বল হয়ে থাকার কথা। কিন্তু সেই ইতিহাস কিছু স্বার্থান্বেষী সামাজিক, রাজনীতির কারণে ধূলিসাৎ হতে বসেছে! তাই তিনি সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন, কুচবিহারের গৌরবময় ইতিহাস ফিরিয়ে আনার জন্য। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর কুচবিহারের মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ভুপ বাহাদুর কোচবিহার রাজ্যকে স্বাধীন ভারতের হাতে তুলে দেন। অল্পকালের মধ্যে মহারাজা পরলোকগমন করেন। তারপর থেকে কুচবিহারের রাজবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। রাজবাড়িকে নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিভিন্ন স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। কেউ হোটেল, কেউ-বা কৃষি কলেজ ইত্যাদি তৈরি করতে চান। মহারাজার গত হওয়ার পরে পরেই রাজবাড়ির অংশ বাসস্ট্যান্ডে পরিণত হয়, কিছু অংশ স্টেডিয়াম হয়। মূল রাজবাড়িকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি শুরু হয়ে যায়। কুচবিহারের রাজকন্যা রাজস্থান রাজ- পরিবারের মহারানি গায়ত্রী দেবী সমস্ত পরিস্থিতির উপর নজর রাখছিলেন, কিন্তু দূরত্বের কারণে এবং সেই সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনকার মতো না থাকায়, সব সময় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের সকলের প্রিয় মাস্টারমশাই যখন জঙ্গলেভরা সবুজ পরিবেশের মধ্যে বাঘের গর্জন শোনা যেত এরকম এক পরিবেশে জন্ম নিয়ে সেই সময় পড়াশোনার জন্য সুদূর কলকাতায় পাড়ি দেওয়া, আজকের দিনে যদি আমরা একটু গভীরভাবে ভাবি তাহলে বুঝতে পারব মাস্টারমশাইয়ের জীবন কণ্টকাকীর্ণ অবশ্যই ছিল। মাস্টারমশাইয়ের জীবন ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাই যখন কুচবিহার রাজবাড়ি ঘৃণ্য রাজনীতি চক্রান্তে ঘিরে ছিল তখন একমাত্র মাস্টারমশাইকে দেখতে পাওয়া যায় স্বমহিমায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নিতে। এ পদক্ষেপ নিতে গিয়ে মহারানি গায়ত্রী দেবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ও যোগাযোগ শুরু হতে থাকে। গায়ত্রী দেবী বুঝতে পেরেছিলেন কোচবিহার রাজ্যে এমন একজন সুদক্ষ, শান্ত, বুদ্ধিমান, নম্র ভাবনা ভাবতে ভাবতে পারেন, বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে সে মানুষের ঐতিহাসিক স্থান রাজবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের যে লড়াই, তা চালিয়ে যেতে পারবো। তাই একটা সময়ের পর মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গায়ত্রী দেবী দেবীর আন্তরিকতা আত্মীয়তার পরিণত হয়। তাই মহারানি গায়ত্রী দেবী তার জীবনের শেষ দিকে 'A Princess Remembers' নামে একটি বই রচনা করেন। এই বই প্রকাশের পরপরই মাস্টারমশাইকে এক কপি পাঠিয়েছিলেন। এবং তিনি একটি চিঠি দিয়ে মাস্টারমশাইকে বইটি বঙ্গানুবাদ করতে অনুরোধ করেছিলেন। যদিও মাস্টারমশাই সে কাজটি করতে পারেননি। যে বইটি মাস্টারমশাইকে পাঠিয়ে ছিলেন সেখানে তিনি নিজের হাতেই তার নাম সই করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯৬৪ সালে মহারানি গায়ত্রী দেবীর ডাকে সাড়া দিয়ে কোচবিহারের এমপি ইলেকশনে স্বতন্ত্র পার্টির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের বিধানসভায় এমএলও প্রার্থী হিসেবে স্বতন্ত্র পার্টির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সময় গায়ত্রীদেবীর সঙ্গে বহুবার মাস্টারমশাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হয়।

তার আগে গায়ত্রী দেবী ছাড়াও মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। কলেজে পড়ার সময় মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের অভ্যর্থনা সভায় মাস্টারমশাই ভাষণ দিয়েছিলেন। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের বধূবরণে তুফানগঞ্জ থেকে প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ অধিকারী ও মাস্টারমশাই নিমন্ত্রিত ছিলেন। কোচবিহার শহরের ল্যান্সডাউন হোটেলে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উনি যখন দেখলেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবার পর কোচবিহারের রাজবাড়ির সঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান দিনের পর দিন ধ্বংসের পথে, পরিচর্যার অভাবে সে সমস্ত জায়গা বেহাত হতে শুরু করেছে, তখন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে কুমার প্রমেন্দ্র নারায়ণের নেতৃত্বে ১০ জনের একটি টিম দেখা করতে দিল্লিতে যান। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছিল। এবং তাঁরা তাদের বক্তব্য পেশ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে বক্তব্য পেশ করেছিলেন এই দলের হয়ে মাস্টারমশাই। তাদের দাবি ছিল রাজবাড়িকে মিউজিয়াম করতে হবে, লাইব্রেরি, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাষ্ট্রপতি নিবাস। ঘোড়াশালে টুরিস্ট লজ, আরেকদিকে বোটানিক্যাল গার্ডেন। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই কথা দিয়েছিলেন তিনি মিউজিয়ামের ব্যাপারে ভেবে দেখবেন। তারপর তিন মাসের মধ্যে দিল্লি থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের পরিদর্শক আসেন রাজবাড়ি

ভিজিট করতে। উনি গোসানি রাজপাট, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, বানেশ্বরের মন্দির, নল রাজার গড়, চিলা রাজার গড়, আরও অনেক পৌরাণিক জায়গা পরিদর্শন করেছিলেন। সেদিন তার সঙ্গে গাইড হিসেবে ছিলেন মাস্টারমশাই। তারপর সেই মহিলা পরিদর্শক ফিরে গেলে কিছুদিন পর রাজবাড়িকে মিউজিয়াম করার কাজ শুরু হয়।

যাই হোক, আজকের এই কোচবিহার রাজবাড়ি মিউজিয়ামে পরিবর্তিত হওয়ার মূলে মাস্টারমশাই এবং তার সঙ্গীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। আজকে হয়তো তাঁদের এই প্ররিশ্রমের কথা ত্যাগের কথা অনেকেই জানে না। কারণ তারা নিজেদের কথা বা নিজেদের পরিশ্রমের কথা কখনো বলেননি। নিঃস্বার্থভাবে এই মানুষগুলো তাদের জন্মভূমির জন্য এগিয়ে চলেছিলেন। মাস্টারমশাই তাঁর কর্মজীবনে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক হিসেবে বহু বছর কাজ করেছেন। সংস্কৃত বিষয়ে তার অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি বেদ, পুরাণ, ব্রাহ্মণ সংহিতা নানা বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন। দর্শনশাস্ত্রেও তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন। গ্লোবাল পিস ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টারমশাই ২০১৯-এর মে মাসের ২১ তারিখে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি কর্মযোগী। দেশে বিদেশে অনেক অনুরাগী। তার আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন সিদ্ধপুরুষ শ্রীমৎ নর-নারায়ণ তীর্থদেব। আধ্যাত্মিক জীবনেও তিনি সফল। অসম ও পশ্চিমবঙ্গে অনেকেই তাঁর সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত। তার ফলে সাহিত্য ও শিক্ষায় ২৫ জানুয়ারি ২০২১ ভারত সরকরের দপ্তর থেকে জানানো হলো আমাদের মাস্টারমশাই পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হবেন। এ খবর আনন্দের। বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা লেগেই আছে, আত্মীয়-স্বজন নাতি নাতনি, ৭ ছেলে-মেয়ে। তারি মাঝে মাস্টারমশাইয়ের মনে সব সময় বেদনার সুর ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে। সে খবর অনেকেরই অজানা! সকলে যখন মাস্টারমশাইকে নিয়ে আনন্দ করছে, সংবর্ধনা দিচ্ছে অপরিদিকে তার জীবনসঙ্গিনী দীর্ঘদিন যাবৎ কঠিন অ্যালজাইমার রোগে আক্রান্ত হয়ে একই বাড়িতে পাশের ঘরে থেকে শেষ যাত্রার দিন গুনছিলেন। অবশেষে পদ্মশ্রী ঘোষণার ১৭ দিনের শুরুতেই ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইহলোক ত্যাগ করে স্বর্গলোকে চলে গেলেন শ্রীমতী সরোজনী বর্মা। রেখে গেলেন অকৃপণ আনন্দ ভালোবাসার মাঝে একটুখানি বেদনার ছোঁয়া। তারপরও মাস্টারমশাই অবিচল থেকেছেন এবং তিনি তার সামাজিক চিন্তা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। তিনি এর মধ্যেও আশাবাদী। শেষ ইচ্ছে তার একটি অসমাপ্ত বই শেষ করতে চান— নাম 'স্মৃতিকথা'। মাস্টারমশাইয়ের শতায়ু কামনা করে তার অসমাপ্ত কাজ যেন, শেষ হয় পরম করুণাময়ের কাছে এই প্রার্থনা করি। অনেক অনেক কথা, স্বল্প পরিসরে অল্প করে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। মাস্টারমশাইকে জানতে গেলে সমুদ্রের অতল গভীরে তলিয়ে যেতে হবে। তবেই এই আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মৃদুভাষী সফল শিক্ষককে জানা সম্ভব। অনেক প্রশ্নই হয়তো প্রশ্নই থেকে যাবে, সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা অনবরত খুঁজতে খুঁজতে একটা সময় হয়তো সঠিক দিশা পাব, তাঁরই দেখানো পথে। ▯

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতার মানিকতলা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অনন্ত কুমার মজুমদার করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। লঘু উদ্যোগ ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ শাখার তিনি এক সময় সভাপতি ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে গেছেন।

******

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গোপালপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন জেলা

সঙ্ঘচালক প্রয়াত যোগেন মাহাতোর সেজো ভাই মনোজ কুমার মাহাতো গত ২ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। পরিবারে রেখে গেলেন স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও তিন ভাই। গোপালপুরে সঙ্ঘের প্রথম শাখা শুরুর সময়ের তিনি স্বয়ংসেবক। উল্লেখ্য, তাঁরা পাঁচ ভাই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

হ্যাঁ ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
MUTUAL FUNDS Sahi Hai
এক উন্নতমানের পরিষেবা
MUTUAL FUNDS Sahi Hai
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

OUR PRODUCTS
- Portfolio Management Services
- Mutual Fund
- Life Insurance
- General Insurance
- Mediclaim
- Accidental Insurance
- Company Bond & Fixed Deposit

OUR PLANNING
- Retirement Planning
- Pension Fund
- Children Education Fund
- Daughter Marriage Fund
- Estate Creation
- Wealth Creation
- Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)
২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com
মিউচুয়াল ফাণ্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

অমর একুশের মুখ ও মুখোশ

দখলদার মুসলমান শাসকরা প্রশাসনের সুবিধার্থে উর্দু ভাষার প্রচলন করে। বস্তুত এটি একটি কৃত্রিম ভাষা। সংস্কৃত ভাষার কন্যা হিন্দির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে আরবি, ফার্সি, তুর্কি শব্দ সংযোজন করে এক খিচুড়ি ভাষা তৈরি হয়।

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি 'বাংলাভাষা দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। বাঙ্গালি বলে পশ্চিমবঙ্গের আমরাও একরকম প্রতিফলিত গর্ববোধ করি। কারণ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ইউনেসকো স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু এটা কি বাংলাভাষী মুসলমানদের বাংলাভাষার প্রতি বিশুদ্ধ ভালোবাসা না অন্য কিছু? সতর্ক ব্যক্তি হিসেবে আমাদের এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

প্রাক্-১৯৪৭-এ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ছিল অবিভক্ত ভারতের অংশ। এর পূর্বে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে স্যার খাজা সলিমুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, নবাব ভিকার-উল-মূলক এবং মৌলবি আবদুল হক প্রমুখ রাজনৈতিক-ধর্মীয় নেতারা ভারতীয় মুসলমানদের লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা হিসেবে উর্দু ভাষার প্রচার করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরে, পূর্বপাকিস্তানে বাংলাভাষী ছিল সাড়ে চার কোটি আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল অন্যান্য ভাষাভাষী আড়াই কোটি। অথচ ১৯৪৭-এর নভেম্বরে করাচিতে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে উর্দু ও ইংরেজিকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সমর্থন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের মন্ত্রী, অসামরিক প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য ছিল।

লেখক আবুল মনসুর আহমেদ বলেছিলেন যে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হয়ে উঠলে পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজ সরকারি পদে 'নিরক্ষর' এবং 'অযোগ্য' হয়ে উঠবে। প্রতিবাদে বাংলাভাষী ইসলামিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিশের সেক্রেটারি আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ঢাকার ছাত্ররা সমাবেশ করে বাংলাকে পাকিস্তানের সরকারি কাজের ভাষা এবং পূর্ববঙ্গে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করে। মজলিশের অধ্যাপক নরুল হক ভুঁইয়ার নেতৃত্বে 'জাতীয় ভাষা অ্যাকশন কমিটি' ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে গঠিত হলো।

তবুও পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন অনুমোদিত বিষয়ের তালিকা এবং মুদ্রা, নোট ও স্ট্যাম্প থেকে বাংলাকে সরিয়ে দেয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সংসদ সদস্য শামসুল হক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঠেকাতে একটি নতুন কমিটি গঠন করেছিলেন। বাংলাকে আরবি লিপিতে লেখার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

সাংসদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানের গণপরিষদেও সরকারি কাজে বাংলা ব্যবহারের অনুমোদন চেয়েছিলেন। প্রস্তাবটিকে পূর্ববঙ্গের বিধায়ক প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং এই অঞ্চলের লোকেরা সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ও মুসলিম লিগ এই প্রস্তাবকে পাকিস্তানি জনগণকে বিভক্ত করার প্রয়াস হিসেবে প্রত্যাখ্যান করায় এই আইনটি চালু হলো না।

১৯৪৮-এর ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের অন্যান্য কলেজের ছাত্ররা এক সাধারণ ধর্মঘটের আয়োজন করে পূর্বোল্লিখিত সরকারি কাজে বাংলাভাষা বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ জানান। সমাবেশ থেকে শামসুল হক, প্রমুখকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতিবাদে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একদল ছাত্র মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের বাড়ির দিকে যাত্রা করে। ঢাকা হাইকোর্টের সামনে তাদের থামানো হলে তারা সচিবালয়ের দিকে এগোয়। পুলিশ মিছিল আটকালে ফজলুল হক-সহ কয়েকজন ছাত্র নেতা আহত হয়। পরবর্তী চার দিন ধর্মঘট পালন করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, মুখ্যমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি না মেনে শর্তসাপেক্ষে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চূড়ান্ত পর্বে, পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলি জিন্না ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় এলেন। ২১ মার্চ এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি দাবি করলেন যে ভাষা সমস্যাটা 'পঞ্চম কলাম' তৈরি করেছিল পাকিস্তানি মুসলমানদের মধ্য বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য। জিন্না ঘোষণা করেছিলেন যে 'উর্দু এবং শুধুমাত্র উর্দু' মুসলমান জাতির চেতনাকে মূর্ত করে এবং তাই উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে থাকবে। তাঁর মতের বিরোধীদের তিনি 'পাকিস্তানের শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করেন। ২৪ মার্চ জিন্না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এবং ২৮ মার্চ রেডিয়োতে অনুরূপ ভাষণ দিয়েছিলেন। জিন্নার বক্তৃতায় বাধা দেওয়া হয়েছিল। পরে তিনি রাজ্য ভাষা কমিটির বৈঠকে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে ছাত্র নেতাদের স্বাক্ষরিত চুক্তিটি বাতিল করে দিয়েছিলেন।

অল্প পরে, ভাষা সমস্যা সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য মওলানা আকরাম খানের সভাপতিত্বে পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটি গঠন করা হলো। এই কমিটি ১৯৫০

ফঃ ২

সালের ৬ ডিসেম্বরের আগে তার প্রতিবেদন সম্পূর্ণ করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি জিন্নার উত্তরসূরি গভর্নর-জেনারেল নাজিমুদ্দিন কঠোরভাবে 'একমাত্র উর্দু' নীতি বহাল রাখায় উর্দু-বাংলা বিতর্ক পুনর্জীবিত হলো। ৩১ জানুয়ারি, মওলানা ভাসানির সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বৈঠকে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের আরবি লিপিতে বাংলাভাষা লেখার প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করে ২১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও সমাবেশ-সহ সর্বাত্মক প্রতিবাদের আহ্বান জানাল। বিক্ষোভ দমন করতে সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারামতে সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল।

২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকে। সশস্ত্র পুলিশ ক্যাম্পাস ঘিরে ফেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাড়ে এগারোটার মধ্যে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে জড়ো হয়ে পুলিশ প্রহরা ভাঙার চেষ্টা করল। ছাত্রদের সতর্ক করতে পুলিশ বেষ্টনীর দিকে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। শিক্ষার্থীদের একটি অংশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দিকে ছুটে যায়, অন্যরা পুলিশ দিয়ে অবরুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের দিকে সমাবেশ করে। উপাচার্য পুলিশকে গুলি চালানো বন্ধ করতে বলেন এবং ছাত্রদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

১৪৪ ধারা লঙ্ঘনের জন্য পুলিশ কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা পূর্ববঙ্গ আইনসভার আশেপাশে বৈঠক করে এবং পথ অবরুদ্ধ করে বিধায়কদের অধিবেশনে এই বিষয়টা জোর দিয়ে পেশ করতে বলে। একদল ছাত্র সংসদ ভবনে জোর করে ঢুকতে চাইলে পুলিশ গুলি চালায়। আবদুস সালাম, রফিক উদ্দিন আহমেদ, সোফিউর রহমান, আবুল বরকত ও আবদুল জব্বার-সহ কয়েকজন নিহত হয়। হত্যার খবরে শহরজুড়ে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। দোকান, অফিস এবং গণপরিবহণ বন্ধ করে দেওয়া হলো, সেই সঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হলো। আইনসভার অধিবেশনে মনোরঞ্জন ধর, বসন্তকুমার দাশ, শামসুদ্দিন আহমেদ ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত-সহ ছয় বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী নুরুল অমিনকে হাসপাতালে আহত ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে এবং শোকজ্ঞাপনের প্রতীক হিসেবে অধিবেশন স্থগিত করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তা করেননি।

এবার দেখা যাক বাংলা ভাষা সম্পর্কে 'বাংলাভাষী মুসলমানদের ধারণা কী?'

তারা বলে উর্দু সুলতানি ও মুঘল উর্দু ইন্দো-ইরানীয় শাখার একটি ইন্দো-আর্য ভাষা এবং ভাষার ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। তারা আরও বলেন এটি মুসলমান শাসনকালে দক্ষিণ এশিয়ায় অপভ্রংশে (মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য ভাষা পালি-প্রাকৃতের শেষ ভাষাগত পর্যায়) ফার্সি, আরবি ও তুর্কি প্রভাবের অধীনে বিকশিত হয়েছিল। ফার্সি-আরবি লিপির সাহায্যে ভাষাটি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ইসলামি সংস্কৃতির একটি অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতো; হিন্দি ও দেবনাগরী লিপি হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক চিহ্ন হিসেবে দেখা হতো। তারা বললেন না যে অপভ্রংশ আসলে সংস্কৃত ভাষা ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নানা আকার ধারণ করার আগের অবস্থা অর্থাৎ অপভ্রংশ সংস্কৃত ভাষার উত্তরসূরি। তার মানে উর্দুর কাঠামো ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত থেকে তৈরি।

প্রকৃত তথ্য হলো বহিরাগত দখলদার মুসলমান শাসকরা প্রশাসনের সুবিধার্থে উর্দু ভাষার প্রচলন করে। বস্তুত এটি একটি কৃত্রিম ভাষা। সংস্কৃত ভাষার কন্যা হিন্দির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে আরবি, ফার্সি, তুর্কি শব্দ সংযোজন করে এক খিচুড়ি ভাষা তৈরি হয়। এর লিপি আরবি। একদিকে বলা হচ্ছে ভারতকে তার হিন্দু সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা যাবে না, অন্যদিকে শুধু 'ইসলামি জাতীয়তাবাদ' নামক বকচ্ছপের সাধারণ্যে গৃহীত ভাষা হবে উর্দু! উত্তর ভারতে মুসলমানদের মধ্যে উর্দুর ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও বাঙ্গলার মুসলমানরা প্রাথমিক ভাবে বাংলাভাষা ব্যবহার করত।

দ্বিতীয়ত, তারা বলেন বাংলা একটি পূর্ব ইন্দো-আর্য ভাষা যা পূর্ব-মধ্য ভারতীয় ভাষাগুলি থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দে উদ্ভূত হয়েছিল এবং বঙ্গ রেনেসাঁর সময়ে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলমান নারীবাদী রোকিয়া সাখাওয়াত হুসেনের মতো সমাজ কর্মীরা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য এবং আধুনিক সাহিত্যের ভাষা হিসেবে এটি বিকাশের জন্য বাংলাভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন। প্রকৃত তথ্য হলো বাংলাভাষায় পদ্য সাহিত্য ত্রয়োদশ শতক থেকেই বিকশিত হয়েছিল। বাংলা গদ্য সাহিত্য অন্য ভাষার মতোই পদ্য সাহিত্যের পরে আসে, যদিও কাজকর্মের জন্য গদ্য প্রচলিত ছিল। এবং তা হিন্দুদের দ্বারাই হয়েছিল যেমন রামমোহন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ। বিদ্যাসাগর বাংলা ব্যাকরণ, বানান ও গদ্যভাষাকে পূর্ণতা দান করেছিলেন। অথচ তারা এসব কথা দুর্বোধ্য কারণে চেপে যায়। যারা বাংলাভাষার ইতিহাস নিয়ে কারচুপি করে তাদের বাংলাভাষার প্রতি আবেগ সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণ করা যায় না।

তৃতীয়ত, বাংলাভাষার মূল হলো ভারতীয় কৃষ্টি। বাংলা ভারতের জলবায়ু দ্বারা পুষ্ট, সংস্কৃত ভাষার গর্ভে এর জন্ম অথচ মুসলমান বাংলাভাষীদের মধ্যে সংস্কৃতের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই। সেখানে শুধুই লালন ও নজরুল বন্দনা। যদিও লালন জন্মগতভাবে একজন হিন্দু, তাঁর নাম লালন কর। তাঁকে খালেদা জিয়া লালন শাহ নাম দিয়ে দেন। যে পরিমাণে আরবি, ফার্সি, তুর্কি শব্দ ঢোকানো হয়েছে তাতে এর মূল চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। এটাকে শ্যামলা বাংলারভাষা না বলে উষর মরুময় আরবের ভাষা বলে মনে হয়। আগেই যেমন বলেছি এদের সুদূর পরিকল্পনা হলো বাংলাকে আরবিকরণ করা এবং সেই দিকেই যচ্ছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে যে আর্থ-রাজনৈতিক কারণের কথা লিখেছি সেটাই ছিল তাদের ভাষা আন্দোলনের মূল প্রেরণা। কারণ তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না উর্দু ভাষা শিখে চাকরি পাওয়া।

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং গবেষক)

মুক্তিযুদ্ধে রক্ত দিলেও হিন্দু বাঙ্গালি এখনও কাফের

স্বর্ণাভ মিত্র

প্রত্যেক বছর একুশে ফেব্রুয়ারি বলতেই আবেগের গঙ্গা-যমুনা বয়ে যায় কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে। হাওয়ায় ভাসা ফাঁপা বুলির ঢক্কানিনাদে ভরে ওঠে আকাশ বাতাস। স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা কীরকম, সেখানে স্বাধীনতার পরেও কেন একাধিকবার পাকিস্তানপন্থী দলের সরকার এসেছে, এইসব আলোচনা সেকুলার পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ। বরং 'বাংলা ভাষার জন্য অস্ত্র ধরেছে, প্রাণ দিয়েছে একমাত্র মুসলমানরাই'— এই ধরনের চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক এবং নির্জলা মিথ্যাগুলোই এ রাজ্যে জনপ্রিয়। যদিও ইতিহাস বলছে অন্য কথা। বাংলাভাষার জন্য দেশভাগের আগে থেকেই বাংলাভাষার জন্য সংগ্রাম করেছেন মানভূমের বাঙ্গালি হিন্দুরাই। বিশ্বের দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলনের স্বীকৃতিও মানভূম ভাষা আন্দোলনেরই হওয়া উচিত। সেই আন্দোলনেরই বিজয় স্মারক হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলার আত্মপ্রকাশ। এসব ইতিহাস ঢেকে দিয়ে শুধু একুশে নিয়ে মাতামাতিটা যে প্রচণ্ড রকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালেও বোঝা যায়।

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ আসলে বাঙ্গালি হিন্দুর জন্য লজ্জার, হতাশার। কারণ ওই ভাষা আন্দোলন শুরুই হয় ১৯৫০ সালে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের হাত ধরে। তিনিই প্রথম উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে সংসদে গর্জে ওঠেন এবং জোরালো ভাষায় বাংলার পক্ষে সওয়াল করেন। এই কাজে তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন আরেক বাঙ্গালি প্রফেসর রাজকুমার চক্রবর্তী। এর প্রতিদান দিতেই পাকিস্তানের খানসেনা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। দুঃখের বিষয়, স্বাধীন বাংলাদেশও তাঁকে সেভাবে মনে রাখেনি।

মুক্তিযুদ্ধ নামক ধোঁকার টাটির বলি প্রধানত পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু বাঙ্গালি হিন্দুরাই হয়েছিলেন। কারণ পাকিস্তান ও তার সহযোগী রাজাকার নেতৃত্বের কাছে বাঙ্গালি হিন্দুরা শুধু কাফেরই ছিল না, ছিল 'যথার্থ ইসলামি ভ্রাতৃত্ব' গড়ে ওঠার প্রধান বাধা এবং এদের প্রভাবে পূর্ববঙ্গে 'ভ্রাতৃসম' মুসলমান জনগোষ্ঠীর 'মুসলমানি' নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই দাবির পক্ষে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ বিখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যারি জে বাস তাঁর গবেষণামূলক বই The Blood Telegram : Nixon, Kissinger and a forgotten genocide'-তে তুলে ধরেছেন। আর্চার ব্লাড ১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত আমেরিকার কনসাল জেনারেল ওয়াশিংটনে প্রতিদিন টেলিগ্রাম মারফত গণহত্যা সংক্রান্ত অজস্র তথ্য প্রেরণ ও তার বিস্তারিত বিবরণ নথিবদ্ধ করেছিলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির হিন্দু অধ্যাপক, গবেষকদের ১৪৮টি লাশ চাপা দিতে দুটি গণকবর ক্যাম্পাসেই খোঁড়া হয়। ২৬ মার্চ সেখানকার হিন্দু ডর্মিটরিতে কমপক্ষে ২৫ জনকে গুলি করে মারা হয় যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রফেসর গোবিন্দ চন্দ্র দেব। আমেরিকান দূতাবাসের কর্মচারী স্কট বুচার গোবিন্দবাবুর বন্ধুপ্রতিম ছিলেন। মিঃ বুচারের মতে, গোবিন্দবাবু ছিলেন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ধর্মীয় পরিচয় ছাড়া তাঁকে হত্যার আর কোনো কারণই থাকতে পারে না। অন্যদিকে মিঃ ব্লাডকে দেওয়া বয়ানে পুরাতন ঢাকার আমেরিকান ধর্মযাজকেরা জানিয়েছিলেন, বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে ও গুলি করে মারছে উন্মত্ত প্রতিহিংসায় মত্ত পাকিস্তানের খানসেনা ও তাদের সহযোগী বাংলাদেশি রাজাকারের দল। হিন্দু গণহত্যার স্পষ্ট অভিযোগ ব্লাড সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কার ভাবে নথিবদ্ধ করে গেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করল বাঙ্গালি হিন্দু, মরল বাঙ্গালি হিন্দু, জমি-জমা বিষয় সম্পত্তি হারাল বাঙ্গালি হিন্দু; অথচ বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হলো, সেই ক্ষমতার ভাগ তারা কিছুই পেল না!

ঢাকার বাইরেও অবস্থা একই রকম করুণ ছিল। মার্কিন অফিসার ডিসেইক্স মায়ের্স বর্ণনা করেছেন কীভাবে দরিদ্র হিন্দু গ্রামগুলিতে হানা দিয়ে রাজাকার বাহিনী হিন্দুদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারত এবং হিন্দু গ্রামগুলি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিত। মিঃ ব্লাডের বয়ানে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে মারা হতো। মায়ের্স তাঁর বাড়িতে লেখা চিঠিতে বলেছেন : 'যেন

বিধর্মী হিন্দুদের মুছে ফেলার মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ শুদ্ধিকরণের পণ নেওয়া হয়েছে।' সেই কারণেই মুক্তিযুদ্ধে নিহত ৩২ লক্ষ বাংলাভাষীর মধ্যে ২৪-২৭ লক্ষই ছিল বাঙ্গালি হিন্দু। প্রখ্যাত বাংলাদেশি মুক্তমনা লেখক সালাম আজাদও ১৯৭০ সাল থেকে শুরু হওয়া হিন্দুদের বেছে বেছে গণহত্যা বা 'selective genocide' নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য একাত্তরের যুদ্ধের বহু আগে থেকেই পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে ঢাকা শহরে মুসলিম লিগের পত্তন হয়েছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে বর্ণনা করেছেন, রাজাকাররা কীভাবে 'লাল ইস্তাহার' নামক কুখ্যাত হিন্দু বিদ্বেষী দলিল ছাপিয়ে হিন্দুদের সম্পত্তি লুঠ করতে, তাদের হত্যা করতে প্ররোচনা দিত। অরুণ মুখার্জি তাঁর 'ক্রাইম অ্যান্ড পাবলিক ডিজর্ডার ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল' বইতে ১৯০৫ থেকে ১৯১২ অবধি শুধু সাত বছরেই ২০০টি হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি হিন্দু গণহত্যা এবং দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং দেখেও বাঙ্গালি হিন্দুর শিক্ষা হয়নি। ১৯৫০ সালে ঢাকা ও বরিশালে নমঃশূদ্র গণহত্যা, ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদের ঘটনাকে ছুতো করে সমগ্র পূর্ববঙ্গে হিন্দু গণহত্যায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বাংলাভাষী মুসলমান নেতৃত্ব। এরপরেও মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থসংগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাড় করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বাঙ্গালি হিন্দু। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অকাতরে দান করেছে মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে। যার জন্য বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক নিজে রাস্তায় নেমে অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত বাঙ্গালি সেতার বাদক রবিশঙ্কর, জনপ্রিয় ইংরেজ ব্যান্ড বিটলসকে অনুরোধ করেন অর্থসংগ্রহের জন্য কনসার্ট করতে। এই কনসার্টের পরেই বিশ্বের প্রচারমাধ্যমের আলো এসে পড়ে বাংলাদেশের উপর। অথচ এত ভাবে সাহায্যের পরেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার তো দূরের কথা, এম আর আক্তার মুকুল কলকাতায় এক প্রকাশ্য জনসভায় এসে বলে যান যে বাঙ্গালি হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরা যেন আর সে দেশে ফেরার চেষ্টা না করেন।

অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশকে বলা হতো বাঙ্গলাদেশ, অর্থাৎ এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বর্তমান বাংলাদেশ ছাড়াও বর্তমান বিহার-ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু অঞ্চল পড়ত। অথচ অন্যায়ভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামকরণ করে, সম্পূর্ণ নামটিই নিজেদের দখলে নেয় শেখ মুজিবের সরকার। সেই বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ঘোষিত হলেও, আইনের ধারাবাহিকতা প্রয়োগাদেশ ১৯৭১ (The Laws of Continuance Enforcement Order, 1971) অনুসারে ১৯৬৫ সালে প্রণীত অবিভক্ত পাকিস্তানের শত্রু সম্পত্তি আইনকে বলবৎ করা হয়। শত্রু সম্পত্তি আইনের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের ভারতের নাগরিক তথা শত্রু বলে গণ্য করে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের জমিজমা দখল করা। শেষপর্যন্ত হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে মুজিব সরকার ১৯৭৪-এর মার্চ মাসে শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করে। পরিবর্তে প্রণীত হয় অর্পিত সম্পত্তি আইন। নাম আলাদা হলেও কার্যকারিতা ছিল ঠিক আগের আইনটিরই মতোই। শেষ পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তি আইনের ছত্রছায়াতেই চলতে থাকে হিন্দু সম্পত্তি দখলের মোচ্ছব।

বাঙ্গালি হিন্দুদের ভাতে মারার জন্য এই আইনের ফলে হিন্দুদের কী চরম ক্ষতি হয়েছে তার কিছুটা হিসেব মেলে ডঃ আবুল বারকাত ও তাঁর সহযোগীদের প্রণীত কয়েকটি বই থেকে। বিশেষ করে An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property (PRIP Trust, 2000) এবং Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh : Living with Vested Property (Pathak Samabesh, 2008) এই দুটি গবেষণামূলক গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি শুধুমাত্র সরকারি হিসেবেই ১১ লক্ষের উপর হিন্দু পরিবার এই আইনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হারিয়েছে ২০ লক্ষ একর জমি, যা বাংলাদেশের হিন্দুদের জমি মালিকানায় ৪৫ শতাংশ। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, হিন্দুরা তাঁদের অধিকাংশ জমি হারান 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং তথাকথিত 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি' মুজিবুর সরকারের সময় থেকে জিয়া সরকারের পতন পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মাস্টারদা সূর্যসেন ও অন্যান্য বহু 'কাফের' মনীষীদের পারিবারিক সম্পত্তি আজও এই আইনের বদান্যতায় বেদখল।

এছাড়াও ১৯৯২ সালের অযোধ্যায় রামমন্দিরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয় এবং বীভৎসতায় তা ছিল কয়েক গুণ বেশি। শ্রীহট্টের ভূমিপুত্র বাঙ্গালি রাজা গৌড় গোবিন্দের হত্যাকারী ইয়েমেনের সুফি শাহ জালালের নামে নামাঙ্কিত করা হয় বাংলাদেশের বিমানবন্দর।

এতসব দেখেশুনেও বাঙ্গালি হিন্দু কি কোনো শিক্ষা নিয়েছে? তাদের মধ্যে কি এই বোধ এসেছে যে মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করল বাঙ্গালি হিন্দু, মরল বাঙ্গালি হিন্দু, জমি-জমা বিষয় সম্পত্তি হারাল বাঙ্গালি হিন্দু; অথচ বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হলো, সেই ক্ষমতার ভাগ তারা কিছুই পেল না! এ তো আমাদের এক বিরাট বড়ো ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার মূল কারণ হলো ভৌগোলিক জাতীয়তা এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই জাতীয়তাবাদী হলেও, দুজনের জাতীয়তাবোধে এক বিরাট বড়ো পার্থক্য আছে। ভৌগোলিক জাতীয়তা হলো শিকড়-বিচ্ছিন্নের একমাত্র সম্বল। এর মূল নীতি হলো যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। এই কারণেই অসমে অনুপ্রবেশ করা বাংলাদেশি মুসলমানরা 'অসম আন্দোলন'-এর সময়ে রাতারাতি অসমীয় হয়ে যেতে পারে। বরাকে বাংলাভাষা আন্দোলনের সময় তার তীব্র বিরোধিতা করতে পারে বা চট্টগ্রাম থেকে বর্মার রাখাইন অঞ্চলে যাওয়া বাংলাদেশি মুসলমানরা ওই নতুন অঞ্চলের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করার জন্য মুহূর্তের মধ্যে জাতি পরিচয় বদলে 'রোহিঙ্গা' নাম নিতে পারে। বাঙ্গালি হিন্দুর জাতীয়তা হলো সাংস্কৃতিক জাতীয়তা। তাই বাঙ্গালি হিন্দু যেই দেশেই যাক, তার ভাষা-সংস্কৃতিকে কখনো কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করতে পারে না। সেই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানেও বাংলাভাষার জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারা লড়াই করেছে। তবে এতে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর ক্রমাগত অত্যাচারের কোনো বদল ঘটেনি। এ আমাদের ভাগ্যের দোষ নয়, নির্বুদ্ধিতার দোষ। স্বজাতির রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির অঙ্ক না কষে, অযথা আন্দোলন জড়িয়ে পড়লে সর্বহারা হতে হয়— একুশে ফেব্রুয়ারির এটাই শিক্ষা। আবেগ বাদ দিয়ে বাঙ্গালি হিন্দু যেদিন মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা আন্দোলনের বিশ্লেষণ করতে বসবে, সেদিনই তারা বুঝবে, ফেব্রুয়ারি হলো ধোঁকার মাস, হতাশার মাস। একুশে আসলে ভাষা দিবস নয়, ধোঁকা দিবস।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : *:দেবব্রত, লেখক : 'একুশের মিথ জয় বাংলার মিথ্যা', বঙ্গদেশ।*

মানভূম ভাষা আন্দোলন।

বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার মাত্র ২৩ বছরে মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষ নতুন একটি স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠা করেছে এটা ইতিহাসে সত্যিই নজিরবিহীন এক অধ্যায়।

বাসুদেব ধর

জিন্নার উদ্ভাবিত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত ভেঙে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। হাজার মাইলের ব্যবধানে ভারতের দুই প্রান্তের দুই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান। দুই অংশের নাম দেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। মুসলিম লিগের নেতারা মুসলমানদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, মুসলমানদের আলাদা হিন্দুমুক্ত আবাসভূমি হলে ইসলামের ঝান্ডা পতপত করে উড়বে, বেহেস্ত নেমে আসবে। দারিদ্র্য থাকবে না, একেবারে মাছ-ভাত-দুধের নহর বয়ে যাবে। এতে মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিল।

ইসলামের নামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও দুই অংশের মানুষের মধ্যে না ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৈকট্য, না ছিল ভাষাগত মিল। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টারা দেশভাগের সময় এই বাস্তবতা ভুলে গিয়েছিলেন যে, অবিভক্ত ভারতে বাংলাভাষী মুসলমানরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯২১ সালের জনগণনায় দেখা যায়, বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৩৯ লাখ ৯৫ হাজার। দ্বিতীয় স্থানে উর্দু-হিন্দি ভাষী ২ কোটি ৭ লাখ ৯১ হাজার, তৃতীয় স্থানে পঞ্জাবিরা ৭৭ লাখ, চতুর্থ সিন্ধী ২৯ লাখ ১২ হাজার। ২৭ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালের শুরুতে সরকারি হিসেবে দেখা যায়, পাকিস্তানের মোট ৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে চার কোটি ৪০ লাখ ছিলেন বাংলা ভাষাভাষী। অর্থাৎ পাকিস্তানের পঞ্জাবি, সিন্ধী, পশতু, বালুচি, ব্রাহুই, উর্দু ও অন্যান্য ভাষাভাষীর মোট সংখ্যার চেয়ে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা অনেক বেশি।

স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থান্বেষীরা শুরু থেকেই দেশের অর্থনীতি ও ভাষা-সংস্কৃতির রাশ তাদের হাতে রাখার ষড়যন্ত্র করে। প্রথম আঘাত আসে ভাষার ওপর। অস্বাভাবিক দেশ পাকিস্তানে গোড়াতেই স্বপ্নভঙ্গ হয় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের। বোধোদয় ঘটে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে। ১৯৪৮ সালের ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি এবং ২ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদের

ফজলুল হক এবং মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আইনবিধি সংক্রান্ত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধির ২৯ নম্বর উপধারা সংশোধন করে 'ইংরেজি'-র সঙ্গে 'উর্দু' যুক্ত করার প্রস্তাব সরকারিভাবে উত্থাপিত হলে গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সঙ্গে বাংলাভাষাও যুক্ত করার সংশোধনী আনেন। তিনি পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা' করার পক্ষে যুক্তি হিসেবে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর প্রস্তাব প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান বলেন, উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের ভাষা উর্দু এবং একমাত্র এই ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ উর্দুই পারে দেশের দুই অংশের জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে।

এই বৈঠকের পর গণপরিষদেও ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। কার্যত পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় এভাবে। পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ওই বছরই ১২ মার্চ ছাত্ররা ঢাকা শহরে ধর্মঘট, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলের মধ্যে দিয়ে প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালন করে। ভাষাকে কেন্দ্র করে নবজাত ইসলামি দেশে রাজপথে আন্দোলনের সূচনা হলো, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামলো ছাত্র সমাজ। গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, 'আন্দোলনের পেছনে ভারতের হাত রয়েছে।' বিক্ষোভকারীদের বাগে আনার জন্য নামানো হয় ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনী, নির্বিচারে গ্রেফতার করা হয় ছাত্র নেতাদের। কিন্তু আন্দোলন দমানো যায়নি। টানা বিক্ষোভের মুখে খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল ও শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ পদত্যাগে বাধ্য হন। প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁর সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসে (বর্ধমানের জমিদারের বাড়ি ও বর্তমানে বাংলা অ্যাকাডেমি ভবন) অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন, তাঁকে উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী তলব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন জি ও সি বিগ্রেডিয়ার আইয়ুব খানের (পরবর্তীতে সেনাপ্রধান ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট) নির্দেশে সেনাসদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে বাসভবনের পেছনের দরজা দিয়ে মুক্ত করে আনেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ নিলে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে চুক্তি সই করতে বাধ্য হন, যাতে বলা হয় এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্য যে দিন নির্ধারিত রয়েছে সেদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এবং তাকে পাকিস্তান গণপরিষদ ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির পরীক্ষায় উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। আরও বলা হয়, ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠে যাওয়ার পরই তার স্থলে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হবে বাংলা। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হবে বাংলাভাষা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজে অধিকাংশ ছাত্রকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে। চুক্তিতে খাজা নাজিমুদ্দিন স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, 'সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন দেশের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।' চুক্তিটি সই হওয়ার আগে তার খসড়া কারাবন্দি ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, শহকত আলি, কাজি গোলাম মাহবুবকে দেখিয়ে আনা হয়।

পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে চুক্তি সই হওয়ার চারদিন অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাত মাস পর পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্না 'পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা' সফরে আসেন। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে

(বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি) এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। যদি আপনাদের কেউ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে সে হবে পাকিস্তানের প্রকৃত শত্রু। ...উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'

২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে বিশেষ সমাবর্তন ভাষণেও জিন্না একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন, উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। তবে ছাত্ররা বজ্রকণ্ঠে 'না', 'না' ধ্বনি দিয়ে সেই ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেন। সেদিন রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি প্রতিনিধিদল জিন্নার সঙ্গে দেখা করে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। জিন্না এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি কার্যত অর্থহীন হয়ে যায়।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্যে পূর্ববঙ্গের মানুষ দেশের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বাঙ্গালিদের বঞ্চিত করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রও লক্ষ্য করেন। শুধু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা নয়, আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের পদক্ষেপও নেওয়া হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে এবং আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ ও পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। প্রায় দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে। এরপর ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয় এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা ব্যাজ বিক্রি করে ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ১০ ফেব্রুয়ারি সরকারবিরোধী ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' নিষিদ্ধ করে পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী ও সম্পাদক আবদুস সালামকে গ্রেফতার করা হয়।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগ সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন এবং সাধারণ ধর্মঘট আহ্বানে শঙ্কিত হয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে এক জরুরি সভায় মিলিত হয়। সভায় অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত দেন। কিন্তু সভা শেষ হওয়ার আগে ছাত্র প্রতিনিধিরা জানিয়ে দেন, তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন, এটা ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত। এর পরও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছাত্ররা অনমনীয় থাকেন।

২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই উত্তেজনা। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে জড়ো হয়। গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। ১৪৪ ধারা ভাঙতে দেবে না। ছাত্ররা বেরোবেই। শেষ মুহূর্তে বেলা বারোটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় আবার ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় ১৪৪ ধারা ভেঙে দশজনের মিছিল এগোবে পরিষদ ভবনের দিকে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে বেরোতে শুরু করলে পুলিশ লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও ফাঁকা গুলি বর্ষণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কলাভবন, লাইব্রেরি ও মেডিক্যাল কলেজে আশ্রয় নেয়, আবার নবোদ্যমে ১৪৪ ধারা ভেঙে এগোতে থাকে। শুরু হয়ে যায় মিছিলের পর মিছিলের ঢেউ। চলে গ্রেফতার, কিন্তু আরেক দল সামনে এগিয়ে আসে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'. 'চুয়াল্লিশ ধারা মানি না, মানবো না'। এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও মেডিক্যাল কলেজ গেট, মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল ও আশেপাশে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

ওইদিন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ছিল, ছাত্ররা পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরিষদ ভবনে (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল মিলনায়তন) যাওয়ার পথে পুলিশ ও ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) কাঁটাতারের ব্যারিকেড ও মেশিনগান পোস্ট বসায়। এ অবস্থায়

ঢাকায় একুশের স্মারক।

ছাত্র-জনতার একটি শোভাযাত্রা মেডিক্যাল হোস্টেল থেকে বেরিয়ে ব্যারিকেড অতিক্রম করে পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে হঠাৎ গুলি চলে।

একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের রাজনীতি পালটে দেয়। ভাষা আন্দোলনই পূর্ববঙ্গের মানুষকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের নির্বাচনে। এই নির্বাচনে মুসলিম লিগের বিস্ময়কর ভরাডুবি ঘটে। বলা যায় পূর্ববঙ্গে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অথচ এই মুসলিম লিগের নেতৃত্বেই পাকিস্তান আন্দোলন হয়েছিল। ভাষা ছাড়াও গোড়া থেকেই অর্থনৈতিকভাবে পূর্ববঙ্গকে বঞ্চিত করা হয়। উন্নয়ন, চাকরি সব ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু পরিসংখ্যান থেকে এই চিত্র স্পষ্ট হবে। পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যে দেখা যায়, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তান) উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়েছে ২৫ কোটি রুপি, পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৮ কোটি রুপি। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ পূর্ববঙ্গ ৫২৪ কোটি রুপি, পশ্চিম পাকিস্তানে ১ হাজার ১২৯ কোটি রুপি। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সালে পূর্ববঙ্গে ব্যয় একই রয়েছে, অর্থাৎ ৫২৪ কোটি রুপি, পশ্চিম পাকিস্তানে ১ হাজার ৬৫৫ কোটি রুপি। ১৯৬০–১৯৬৫ সময়ে পূর্ববঙ্গে ১ হাজার ৪০৪ কোটি রুপি, পশ্চিম পাকিস্তানে ৩ হাজার ৩৫৫ কোটি রুপি। ১৯৬৫–১৯৭০ পূর্ববঙ্গে ব্যয় হয়েছে ২ হাজার ১৪১ কোটি রুপি, পশ্চিম পাকিস্তানে ৫ হাজার ১৯৫ কোটি রুপি।

আরেক তথ্যে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রকল্পে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার ৮০ শতাংশ ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে, ২০ শতাংশ পূর্ববঙ্গে। সরাসরি বৈদেশিক সাহায্যের ৯৬ শতাংশ ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে, মাত্র ৪ শতাংশ পূর্ববঙ্গে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ববঙ্গের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫ হাজার ২৪০ কোটি রুপি, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১১ হাজার ২৯০ কোটি রুপি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকে পূর্ববঙ্গের বরাদ্দ একই থাকে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ গিয়ে দাঁড়ায় ১৬ হাজার ৫৫০ কোটি রুপিতে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকে পূর্ববঙ্গের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১৪ হাজার ৪০ কোটি রুপি, ২১ হাজার ৪১০ কোটি রুপি ও ৪৫ হাজার ৯৩০ কোটি রুপি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৩৩ হাজার ৫০০ কোটি রুপি, ৫১ হাজার ৯৫০ কোটি রুপি ও ১ লাখ ১৩ হাজার ৩৪০ কোটি রুপি।

ত্রিশ লাখ মানুষের আত্মদান, চার লাখের বেশি নারীর সম্ভ্রম হানি ও নির্যাতিত হওয়ার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বেসামরিক চাকরিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্থান ছিল ৮৪ শতাংশ, পূর্ববঙ্গের ১৪ শতাংশ। বৈদেশিক চাকরিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থান ৮৫ শতাংশ, পূর্ববঙ্গের ১৫ শতাংশ। সেনাবাহিনীর মধ্যে বৈষম্য ছিল সবচেয়ে প্রকট। স্থলবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যা ৯৫ শতাংশ, পূর্ববঙ্গের ৫ শতাংশ। নৌ বাহিনীতে কারিগরি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান ৮১ শতাংশ, পূর্ববঙ্গ ১৯ শতাংশ, আর অকারিগরি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান ৯১ শতাংশ, পূর্ববঙ্গ ৯ শতাংশ। বিমান বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তান ৮৯ শতাংশ, পূর্ববঙ্গ ১১ শতাংশ।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত মোট রপ্তানিতে পূর্ববঙ্গ থেকে পাঠানো পণ্যসামগ্রী থেকে পাওয়া গিয়েছিল ২৫ হাজার ৫৫৯ মিলিয়ন রুপি, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো পণ্যসামগ্রী থেকে এসেছিল ২১ হাজার ১৩৭ মিলিয়ন রুপি। সে সময় সোনালি আঁশ নামে খ্যাত পূর্ববঙ্গের পাটই ছিল সবচেয়ে বড়ো রপ্তানি সামগ্রী। আমদানি খাতে পশ্চিম পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিল ২৯ হাজার ৬২৯ মিলিয়ন রুপি। অথচ পূর্ববঙ্গকে দেওয়া হয়েছিল ১৭ হাজার ৬৭ মিলিয়ন রুপি। এসব তথ্য ১৯৭০ সালে করাচিতে প্রকাশিত মান্থলি ফরেন ট্রেড স্ট্যাটিসটিক্স থেকে পাওয়া গেছে। অনেক অর্থনীতিকের মতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা অর্থের পরিমাণ ছিল ২ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এই প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গ স্বাধিকারের চেতনা দ্রুত বিকশিত হয়, যার সূচনা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯৫৪ সালে নির্বাচিত পূর্ববঙ্গ সরকার বেশিদিন টিকতে পারেনি। তাদের সরিয়ে দিয়ে সামরিক আইন জারি করা হয়। পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থ রক্ষা করতে সেনাপতি আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। এদিকে আওয়ামি লিগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি নবজাগরণে উজ্জীবিত হয়। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবি পেশ করেন, যার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। বলা হয় পৃথক মুদ্রার কথা, পূর্ববঙ্গের আয় পূর্ববঙ্গের জন্য ব্যয়ের কথা। পাকিস্তানি সেনাশাসকরা তা মানতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে তড়িঘড়ি কারাগারে পুরে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগ আনা হয়, আগরতলায় ভারত সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু গোপন বৈঠকে মিলিত হন, বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চান। ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে সামরিক আদালতে বিচার শুরু হলে দেশে গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়। টলমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে শেষ পর্যন্ত মুজিবকে মুক্তি দিয়ে মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হয় সরকার। এর মধ্যে পদত্যাগে বাধ্য হন আইয়ুব খান, ক্ষমতার মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে নতুন সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের। তিনি নির্বাচন ঘোষণা করে পরিস্থিতি সামাল দেন। সেই ইতিহাস এক নদী রক্ত। ত্রিশ লাখ মানুষের আত্মদান, চার লাখের বেশি নারীর সম্ভ্রম হানি ও নির্যাতিত হওয়ার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার মাত্র ২৩ বছরে মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষ নতুন একটি স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠা করেছে এটা ইতিহাসে সত্যিই নজিরবিহীন এক অধ্যায়।

মায়ানমারে অভ্যুত্থানের পিছনে কি চীনের হাত?

ধীরেন দেবনাথ

ফেব্রুয়ারির এক তারিখে মায়ানমারে ঘটেছে সামরিক অভ্যুত্থান। এক রক্তপাতহীন সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সে দেশের ক্ষমতা দখল করেছে সেনাবাহিনী। গৃহবন্দি হয়েছেন স্টেট কাউন্সিলর আন সাং সুকি। রাষ্ট্রপতি উইনমিন্ট-সহ শাসকদলের অনেক নেতাকেও করা হয়েছে আটক। এই অভ্যুত্থানের খবর জানাজানি হতেই বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন সে দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সুকি-সহ অন্যান্যদের মুক্তি দাবি করেছে নিরাপত্তা পরিষদ। ভারত-সহ বহু গণতান্ত্রিক দেশ এ ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সুকি-র মুক্তি দাবি করে কড়া হুমকি দিয়েছে। এমনকী ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ, দমনপীড়ন ও ধরপাকড়ের প্রতিবাদে সেনাশাসকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে দেশবাসী। তারা অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সেনাশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে বসবাসরত মায়ানমারের নাগরিক-সহ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ প্রতিবাদে সরব হয়েছে এবং সুকি-র মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে চীন প্রতিবাদ তো জানায়ইনি, উলটে ওই ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বলেছে, 'বেজিং মায়ানমারের পাশে যেমন ছিল তেমনিই থাকবে।' আর এখানেই দানা বাঁধছে সন্দেহ। উঠছে প্রশ্নও। তবে কি মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে চীনের হাত ও মদত আছে? প্রশ্নটি কিন্তু অমূলক নয়। কারণ স্বৈরাচারী, মাওবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী চীনের শকুনের দৃষ্টি রয়েছে মায়ানমারের দিকে। চীনের সঙ্গে রয়েছে এই দেশটির সীমান্ত। তাই সড়ক পথে দেশটির সঙ্গে চীনের রয়েছে দীর্ঘ যোগাযোগ ব্যবস্থা। মূলত সড়ক পথেই চলে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য। এই মুহূর্তে মায়ানমারের সঙ্গে চীনের বহু লক্ষ কোটি ডলারের বাণিজ্য

রয়েছে। সুকি সরকারের সঙ্গে চীনের অর্ধ-শতাধিক বিভিন্ন বিষয়ক চুক্তি রয়েছে। এগুলির মধ্যে বিভিন্ন দ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সড়ক নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ভারত-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের আগ্রাসী ও আধিপত্য বিস্তারের ঘটনাবলী বিশেষত ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনা লাল ফৌজের অনুপ্রবেশ ও ভারতীয় ভূখণ্ড দখলের প্রয়াস বা আগ্রাসনজনিত কারণে ভারতীয় সেনার সঙ্গে লালফৌজের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ তথা হতাহতের ঘটনাবলী, আকসাই চীন-সহ ভারতের কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলের পরেও অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম ও লাদাখকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করা ছাড়াও তাইওয়ান, দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের বেশ কিছু দ্বীপকেও নিজেদের বলে দাবি করছে চীন। এইসব জায়গা তারা স্বেচ্ছায় ছেড়ে না দিলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধেরও হুমকি দিচ্ছে। ঔদ্ধত্য আর কাকে বলে! সত্যি বলতে, সাম্রাজ্যবাদী কমিউনিস্ট চীন তার জন্মলগ্ন থেকে সম্প্রসারণবাদী মানসিকতা নিয়ে এগোচ্ছে। অধিকন্তু সে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। কাজেই তাকে ঠেকায় কে? এটাই তার অহমিকা। গণতন্ত্র ও মানবতার শত্রু কমিউনিস্ট দেশগুলি এইরকমই করে থাকে।

সুকি শান্তিপ্রিয়। মানবাধিকারের পক্ষে। সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধ শতাব্দী মায়ানমার ছিল সেনাশাসনে। স্বাভাবতই তিনি যে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের পক্ষে আন্দোলনে শামিল হবেন তা বলাই বাহুল্য। আর তা করতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন সেনাশাসকের হাতে। দীর্ঘ প্রায় দু'দশক তিনি ছিলেন গৃহবন্দি। তাঁর বন্দিদশা চলাকালে বিভিন্ন দেশে তাঁর মুক্তির দাবি ওঠে। স্বৈরাচারী, গণতন্ত্র হত্যাকারী ও মানবতা বিরোধী সেনাশাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন বিশ্বের শান্তিপ্রিয় ও মানবতাবাদী জনগণ। সৃষ্টি হয় তাঁর পক্ষে জনমত। তাই প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার সুকি-কে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তিনি পান শান্তিতে 'নোবেল পুরস্কার'-সহ বহু আন্তর্জাতিক খেতাব ও পুরস্কার। তিনি গঠন করেন রাজনৈতিকদল— 'ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি'। অবশ্য দশ বছর আগেই সেদেশে সেনাশাসনের অবসান ঘটে।

গত বছর নির্বাচনে সুকি-র দল বিরোধীদের বিপুলভাবে পরাজিত করে ৪২৫টি আসনের মধ্যে পায় ৩৪৬টি। কিন্তু সেনাকর্তরা তাঁর এই

সুকি-সরকারের ভারতবন্ধুতা চীনের কাছে অশনি সংকেত। তাই গণতান্ত্রিক সুকি সরকারকে উৎখাত করতে চীন কী মায়ানমারের সামরিক সরকারকে মদত দিয়েছে— এ প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

ফঃ ৩

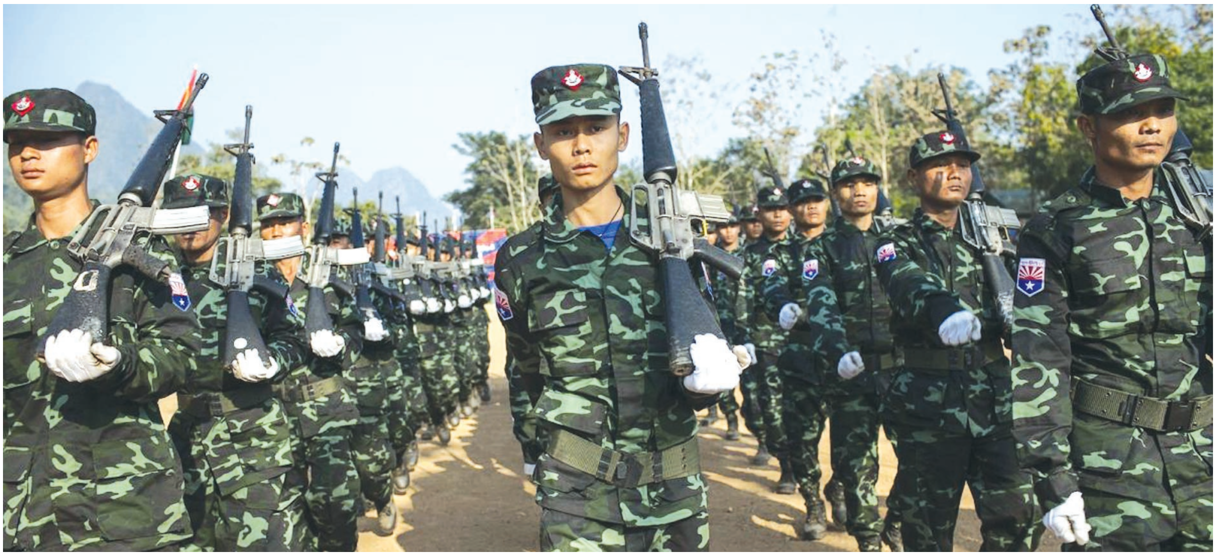

মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান।

জয়কে মেনে নিতে পারেননি। তাদের অভিযোগ, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির ফলেই জয় এসেছে। তাছাড়া রোহিঙ্গা ইসুগত বিভিন্ন কারণে সরকারের সঙ্গে সেনাবাহিনীর মতদ্বৈততা চলছিল। আর সেটাই সুকি সরকারের ভাগ্যচক্রকে ঘুরিয়ে দেয়। সুকি সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছু কড়া পদক্ষেপ নেয়। চীনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত অধিকাংশ চুক্তি কয়েকমাস আগে একতরফাভাবে বাতিল করে দেয়। পড়শী দেশগুলি বিশেষত ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করে। বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ হয়। তার মধ্যে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে কিছু দ্বীপের সংযোজক সড়ক নির্মাণ অন্যতম। ইতিমধ্যেই একটি সেতু নির্মিত হয়েছে চীনের নির্ধারিত খরচের চেয়ে অনেক কম খরচে। আর এই ‘বাড়া ভাতে ছাই’ দেওয়াকে চীন ভালোভাবে নেয়নি। চীন চাইছে না, ভারতের সঙ্গে সুকি সরকার বন্ধুত্ব গড়ে তুলুক। মায়ানমারের বাণিজ্যের দরজা ভারতের জন্য খুলে রাখুক। কারণ তাতে যে চীনের বিরাট আর্থিক ক্ষতি! তাছাড়া মোদী সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্বের বহু দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়িয়েছে ও বন্ধুত্ব। নেপালে চীনের মদতপুষ্ট মাওবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দীর্ঘকালের ভারত-নেপাল বন্ধুত্বের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল। ইদানীং সেই হ্রাসপ্রাপ্ত সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ নেপালের মাওবাদী সরকার পতনের মুখে। চীনপন্থী পাকিস্তানের ইমরান সরকারের আয়ুও শেষ হতে চলেছে। চীনের দুই বন্ধু দেশ শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপও ইদানীং ভারতের দিকে ঝুঁকেছে। এছাড়াও আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিল, ইজরায়েল, সৌদিআরব, আমিরশাহি, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া-সহ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া-সহ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অধিকাংশ দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক পেয়েছে বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যবসা- বাণিজ্যও। অতঃপর অতিমারী করোনা ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী সংক্রমণের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ অনাহার, দারিদ্র্য, চিকিৎসা ও কর্মহীনতার শিকার হয়েছে। পক্ষান্তরে, প্রায় ১৪০ কোটি মানুষের দেশ ভারত করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হয়েছে জয়ী। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে এদেশের উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও করোনার প্রতিষেধক ওষুধ— যে ওষুধ দিয়ে মোদী সরকার বিভিন্ন দেশকে সাহায্য করেছে। ফলশ্রুতিতে ভারতে মৃত্যুর হার এক শতাংশেরও কম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক উন্নত দেশ ও চীনে যখন করোনা নতুন করে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তখন ভারত করোনামুক্ত হওয়ার পথে। ইতিমধ্যে ভারতে তৈরি হয়েছে কোভ্যাকসিন ও কোভিশিল্ড সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে। টিকাকরণ শুরু হয়ে গেছে। ফলাফল আশাব্যঞ্জক ও নিরাপদ। ১৭-১৮টি দেশে পৌঁছেও গেছে এই টিকা। ভারতের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (হু)। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে চীনের বন্ধু নেপাল, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ইত্যাদি। এই সুবাদে ভারত বিশ্বে প্রথম দেশের শিরোপা পেয়েছে। দিনদিন বিশ্বে বাড়ছে ভারতে উৎপাদিত ভ্যাকসিনের কদর ও চাহিদা। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই, যে সব দেশ বিশেষ করে আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন ও চীন করোনা ভ্যাকসিনের সফল উৎপাদক দেশ রূপে নিজেদের জাহির করেছিল, কার্যক্ষেত্রে তাদের ভ্যাকসিনের চাহিদা বিশেষ নেই। কারণ সেগুলির রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা যথেষ্ট কম। ভারতীয় ভ্যাকসিনের প্রতিষেধক ক্ষমতা যেখানে প্রায় ৮০ শতাংশ, সেখানে চীনের ভ্যাকসিনের প্রতিষেধক ক্ষমতা ৪০ শতাংশেরও কম। তাই চীনা ভ্যাকসিনের চাহিদা বন্ধুদেশ পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায় মায়ানমারেও নেই। স্বভাবতই ভারতীয় ভ্যাকসিনের বরাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, করোনাকালে ভারতসীমান্তে চীনের লাল ফৌজের সশস্ত্র আগ্রাসনকে প্রতিহত করেও করোনা সংক্রমণ রুখতে করোনা ভ্যাকসিন প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ভারত। করোনার আক্রমণে ভারতের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ধ্বংস হয়ে যায়নি বরং ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এই অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ১১ শতাংশে পৌঁছবে বলে আশা। আইএমএফ- এরও তাই ভবিষ্যদ্বাণী। তাদের ধারণা, সেই প্রবৃদ্ধি চীনকেও ছাড়িয়ে যাবে।

এমনিতেই চীনা ভ্যাকসিনের বিশ্বে কদর নেই। অধিকন্তু করোনা ভাইরাসের জন্মদাতা ও বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ার দায় চীনের উপরে চাপিয়ে বিশ্বের বহু দেশ চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করেছে। ফলে চীনের অর্থনীতিতে ধস নেমেছে। সেখানে শত্রু দেশ ভারতের আর্থিক প্রবৃদ্ধি রেকর্ড গড়ার সম্ভাবনায় চীন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

ভারত-সহ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিতে চীনের আগ্রাসন, হংকংয়ে দমনপীড়ন, সম্প্রসারণবাদী ক্রিয়াকলাপ ও গণতন্ত্রহীনতা সুকি-সরকারকে চীন বিরোধী ও ভারতবন্ধু করে তুলেছে, যা চীনের কাছে এক অশনি সংকেত। তাই গণতান্ত্রিক সুকি সরকারকে উৎখাত করতে চীন কী মায়ানমারের সামরিক সরকারকে মদত দিয়েছে— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শিশু গড়ার মূল কারিগর মা-বাবা

দেবযানী দেব

একটি শিশুকে বড়ো করে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা হচ্ছে মা-বাবার। সেই ক্ষেত্রে মা ও বাবাকে নিজেদের সংযমে রাখা একটি প্রাথমিক শর্ত হওয়া প্রয়োজন। শিশুর সামনে মা ও বাবার কী করা উচিত আর কী করা উচিত না তা মা-বাবার নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হবে। তাই শিশুর সামনে এমন কিছু করা উচিত না, যা শিশুমনে দাগ কেটে থাকে। আমরা যখন স্বামী, স্ত্রী নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি তখন ভুলে যাই শিশুটি সবকিছু দেখছে ও বুঝছে। আর এটা তার ভবিষ্যৎ জীবনেও একটা প্রভাব পড়বে। অনেক সময় বাচ্চাদের সামনেই আমরা পার্টি করি বা ড্রিঙ্ক করে থাকি তা অদূর ভবিষ্যতে বাচ্চার জীবনে কুফল ডেকে আনবে। কারণ, ছোটোদের স্মৃতিতে কিছু কিছু দৃশ্য বা ঘটনা যা কোনো দিনও তারা ভোলে না বা ভুলতে পারে না এবং দেখা যায় বড়ো হয়ে সেটাই বুমেরাং হয়ে বাস্তব জীবনে এসে পড়ে। তাই সন্তানের সামনে যতটা পারুন সংযত থাকুন।

আমরা মা-বাবা সবসময় ভেবে থাকি আমরা আমাদের জীবনে যা যা পাইনি সেটা যেন আমাদের সন্তানেরা পায়। সেগুলো যেন ওরা কোনও ভাবে মিস না করে। তাই ওদের কেন্দ্র করে আমরা একের পর এক স্বপ্নের সেতু তৈরি করে থাকি। যে স্বপ্নগুলো একান্তই আত্মকেন্দ্রিক। যেমন— আমাদের সন্তানকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে, অন্য বাচ্চার চেয়ে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতেই হবে, ভালো নম্বর পেতেই হবে। কিন্তু আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি আমাদের স্বপ্নগুলো পূরণ করার মতো আদৌ কি তাদের সেই মেধা আছে? আসলে আমরা বাচ্চার কাছ থেকে যতটুকু প্রত্যাশা করছি সেটা করার মতো যোগ্যতা তার আছে না নেই সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি না বা দেখার চেষ্টা করছি না। একটি বাচ্চাকে গড়ে তুলতে গিয়ে আমরা বাচ্চার বাইরের চকচকে দিকটা দেখে কত কিই-না স্বপ্নের জাল নিজের অজান্তেই বুনে ফেলি। সে মানুষ হিসেবে কতটা সৎ, পরার্থপর হয়ে বেড়ে উঠছে কিনা তার খেয়াল রাখি না। তাই ও যখন বড়ো হয় তখন মা-বাবার কোনও জিনিস শেয়ার করতে চায় না। বড়ো হয়ে একবারও ভাবে না মা-বাবার জন্যে কিছু কর্তব্য করা উচিত কিনা?

আবার কোনও কোনও সময় দেখা যায় বাচ্চাদের চাহিদানুযায়ী আমরা মা-বাবারাই যখন ওরা যা চায় তাই দিয়ে দিই। বাচ্চাদের অক্ষর পরিচয়ের আগেই ডিজিটাল ঘড়ি দিয়ে দিই। তাই এখনকার বাচ্চারা তাদের পছন্দের জিনিসটা তৎক্ষণাৎ পেয়ে যাওয়াতে সেটা তাদের একমাত্র অধিকার বলে ধরে নিচ্ছে এবং সেটা না পেলেই রাগ, অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাতে পরিবার অশান্তিতে ভুগছে। তাই মা-বাবাদের এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে।

যেসব মা-বাবা চাকরি করেন তাদের খুব স্বাভাবিকভাবেই বাচ্চাকে সময় দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তারা বাচ্চাকে দাদু-ঠাকুমা বা আয়ার কাছে রেখে চাকরিতে যান। সেসব বাচ্চা প্রতি সময় বাবা ও মা'কে বড়ো মিস করে। তারা মনে করে মা-বাবার স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার থেকে ওরা বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে আস্তে আস্তে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে বাবা ও মা'র প্রতি একটি ক্ষোভ জন্মায়। তার ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে দেখা যায় তারা মা-বাবাকে দেখতে পারে না বা চায় না। তাই আমাদের এ ব্যাপারে একটু সহানুভূতিশীলভাবে ব্যাপারটা দেখা উচিত। আমরা ছুটির দিনে অন্যান্য সমস্ত কাজকে বাদ দিয়ে দিনটা বাচ্চাদের সঙ্গে যদি কাটাই। যেমন ধরুন ওদের পার্কে নিয়ে বেড়িয়ে আসা বা কাছে কোথাও পিকনিক করে আসা, তাহলে বাচ্চাদের অভিমান কিছুটা হলেও কমবে। সন্তানদের জন্যে সবচেয়ে ভালো অবশ্যই পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। যে পরিবেশে বাচ্চাদের একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন তৈরি হতে পারে। শান্ত ও সুস্থ পরিবেশ বাচ্চাদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক। বাবা-মা'র মধ্যে ডিভোর্স, মাদকাসক্তি, মতপার্থক্যে বাচ্চারা প্রচণ্ড ভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। প্রত্যেক দিন যদি কোনও পারিবারিক কলহ বাচ্চাদের চোখের সামনে ঘটে তাহলে তাদের শিশুমনে গভীর ভাবে দাগ ফেলে, যার ফলস্বরূপ তারা হিংস্র হয়ে যেতে পারে। তাই যতটুকু পারা যায় ওদের সামনে সংযত থাকা উচিত।

ম্যাডাম মারিয়া মন্তেশ্বরীর একটি উদ্ধৃতিতে বলেছেন যে, পৃথিবীটা শিশুদের কাছে অনেক সুন্দর। বড়োরা তাদের কাছে কোনও জোর না খাটিয়ে তাদের সুশিক্ষা দেন তাহলে পৃথিবীটা আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। ▯

টুথব্রাশ অবশ্যই জীবাণুমুক্ত রাখুন

দাঁতের ডাক্তাররা সব সময়ই আমাদের উপদেশ দেন দিনে দু'বার ব্রাশ করার। সকালে ঘুম থেকে উঠে ও রাতে ঘুমোতে যাবার আগে প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ করা উচিত। এতে দাঁত ভালো থাকে। কিন্তু দাঁতকে ভালো রাখতে প্রতিদিন টুথব্রাশকে জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে এটা অনেকেই জানেন না। দাঁতের যত্নে কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তিন বা চার মাসে শুধু একবার ব্রাশ পাল্টে নিলে হবে না, ব্রাশকে জীবাণুমুক্ত রাখতে আপনাকে কী কী করতে হবে আর কী কী করতে হবে না সেগুলো জেনে নেওয়া উচিত।

কী করবেন : প্রতিদিন সকালে বা রাতে টুথব্রাশ ব্যবহার করার সময় ভালো করে জলে ধুয়ে নেবেন। টুথব্রাশে যদি কোনও ধুলো বা নোংরা থাকে, তা ধুয়ে নেবার ফলে পরিষ্কার হয়ে যায়। ব্রাশ ব্যবহার করার আগেই শুধু নয়, ব্রাশ ব্যবহার করার পরেও ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নেবেন। এতে ব্রাশের মধ্যে কোনও নোংরা থাকবে না। দিনে যখন আপনি ব্রাশ ব্যবহার করবেন প্রতিবারই এভাবে ব্রাশ ধুয়ে তারপর ব্যবহার করবেন। মনে রাখবেন, একটু বেশি সময় ধরে ব্রাশ জল দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত। তাহলে আপনার ব্রাশ অনেকটাই জীবাণুমুক্ত থাকবে।

পরিষ্কার করুন : প্রতিদিন হোক বা দু'দিন অন্তর, টুথব্রাশ অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল মাউথওয়াশে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে নিন, তারপর পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। ব্রাশ পরিষ্কার রাখতে তিন মিনিট মতো গরম জলে ব্রাশ ফুটিয়ে নিতে পারেন। বাচ্চাদের ব্রাশ অনেকেই গরম জলে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর ব্যবহার করান। বড়োদের ক্ষেত্রেও ব্রাশ একই পদ্ধতিতে অন্তত তিন মিনিট গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়া উচিত। এতে ব্রাশ জীবাণুমুক্ত থাকে।

সঠিক জায়গায় রাখুন : ব্রাশ সঠিক জায়গায় রাখাটা খুব জরুরি, না হলে আরশোলা বা অন্য কোনও পোকামাকড় ব্রাশের ওপর দিয়ে চলে যেতে পারে। তাই ব্রাশ এমন জায়গায় রাখবেন যেখানে সহজে পোকামাকড় পৌঁছতে পারবে না।

ছোটোদের ব্রাশ বড়োদের ব্রাশের থেকে আলাদা রাখবেন। সব থেকে ভালো হয় যদি আপনি ঢাকা দেওয়া জায়গায় ব্রাশ রাখেন। ব্রাশ রাখার জন্য ইউভি টুথব্রাশ স্যানিটাইজারও ব্যবহার করতে পারেন। আপনার টুথব্রাশকে জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করবে।

ক্যাপ ব্যবহার করুন : টুথব্রাশ ক্যাপ ব্যবহার করতে ভুলবেন না। আগে এই ধরনের কোনও ক্যাপ টুথব্রাশের সঙ্গে দেওয়া হতো না। কিন্তু এখন প্রায় সব টুথব্রাশের সঙ্গে টুথব্রাশ ক্যাপ দেওয়া হয়। টুথব্রাশ ব্যবহারের পর অবশ্যই টুথব্রাশ ক্যাপ লাগিয়ে রাখবেন। না হলে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া আপনার টুথব্রাশে বাসা বাঁধবে। পরিবারের সকলের ব্রাশ একই জায়গায় রাখবেন না। যদি রাখেন তাহলে প্রত্যেকের ব্রাশে যেন আলাদা ক্যাপ লাগানো থাকে সেদিকটা খেয়াল রাখবেন।

ভুল করেও করবেন না : টুথব্রাশ ব্যবহারের পর কোনও ড্রায়ার বা ক্যাবিনেটের মধ্যে ব্রাশ রাখবেন না। চিকিৎসকরা বলেন, অন্ধকার বা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে ব্রাশ রেখে দিলে জীবাণুরা বেশি হামলা করতে পারে। তাই ব্রাশ এমন জায়গায় রাখুন যেখানে হাওয়া-বাতাস লাগবে। কোনও নোংরা কাপ বা ট্রাভেল কেসের মধ্যে ভুল করেও ব্রাশ রাখবেন না। এইসব জায়গায় ব্রাশ রাখলে আপনার জিনজিভাইটিস-এর মতো রোগ হতে পারে।

কারোর সঙ্গে নয় : নিজের ব্রাশ কাউকে ব্যবহার করতে দেবেন না। অনেকেই আছেন যারা নিজের ব্রাশ দিয়ে বাচ্চার দাঁত পরিষ্কার করে দেন। এটা কখনোই করবেন না। এতে আপনার দাঁতের ইনফেকশন বাচ্চার দাঁতে চলে যেতে পারে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে জীবাণু খুব দ্রুত আক্রমণ করে। তবে শুধু বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই নয়, পরিবারের যে কোনও কারোর ব্যবহার করা ব্রাশ ব্যবহার করা উচিত নয়।

নজর দিন : প্রতিদিন সকালে-রাতে টুথব্রাশ ব্যবহার করলেন আর রেখে দিলেন— এই ভুলটা কখনওই করবেন না। কারণ আপনার প্রতিদিন ব্যবহারের জিনিস আদৌও ব্যবহারের যোগ্য আছে কিনা সেটা আপনার খেয়াল রাখা উচিত। প্রতিদিন ব্যবহার করতে করতে আপনার ব্রাশের রং যদি ফ্যাকাশে হয়ে যায় বা ব্রাশের ব্রিশটেলগুলি সঠিক না থাকে, তাহলে বুঝবেন আপনার প্রতিদিনকার ব্যবহৃত ব্রাশ পাল্টানোর সময় এসেছে। ব্রাশের এই লক্ষণগুলি দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশ পালটে নিন। একটি টুথব্রাশ তিন বা চার মাসের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। আপনি যদি ছ'সাত মাসের বেশি সময় ধরে একটা টুথব্রাশ ব্যবহার করেন, তাহলে এখনই ব্যবহার বন্ধ করে দিন। কারণ মুখের বা দাঁতের নানা সমস্যা কিন্তু টুথব্রাশ থেকে হতে পারে।

(হেলথ জার্নাল থেকে)

কলকাতার ছবিতে ঢাকার শিল্পী জয়া আহসান।

বাংলাদেশি বাংলার দাপটে স্বকীয়তা হারাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা

চন্দ্রিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি,
আমি কি ভুলতে পারি!'

এই গান গেয়ে গত ক'বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গে একদল সুযোগসন্ধানী মানুষের উদ্যোগে বেশ ধুমধাম করে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন হচ্ছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে বাঙ্গালিকে গেলানো হচ্ছে যে ওই দিনটিই হলো মাতৃভাষা দিবস। আর এই ভাষা দিবসের প্রেক্ষিতে এ রাজ্যের প্রায় সকল বাঙ্গালিরই পরিচয় রয়েছে গানের ওই দুটি পঙ্ক্তির সঙ্গে। আপত্তির শুরুও সেখান থেকেই। প্রতি বছরের মতো এই বছরও একুশে ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে নিশ্চয়ই ভাষা শহিদদের সম্মান জানানো হবে, ধুমধাম করে পালিত হবে ভাষা দিবস। বর্তমান বাংলাদেশের পরাধীনকালে বাংলাভাষাকে রক্ষা করতে যে আন্দোলন পুঞ্জীভূত হয়েছিল তাকে সম্মান জানাতেই ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনিসেফ একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। তারপর থেকে যত সময় এগিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ভাষা দিবস উদযাপন আকারে বা বহরে ক্রমবর্ধমান। কিন্তু যে ভাষাকে রক্ষা করতে এক সময় রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হয়েছিল সেই ভাষাকে কি আমরা হিন্দু বাঙ্গালিরা যথার্থ সম্মান দিতে পেরেছি? তোলা হয় এরকম বিভ্রান্তিকর প্রশ্নও। বিভ্রান্তিকর কারণ কলকাতায় উর্দু, ফার্সি, ইংরেজি বিদেশি ভাষার দৌরাত্ম্য তো ছিলই, এখন আমাদের মাতৃভাষা বাংলা বাংলাদেশি বাংলার দাপটে নিজের স্বকীয়তা হারাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে মানভূম ভাষা আন্দোলনের কথা। বাংলা ভাষার জন্য প্রথম আন্দোলন সংগঠিত হয় এই মানভূম অঞ্চলেই। এর সূত্রপাত প্রায় একশো বছর আগে। অথচ খোদ ভারতবর্ষেই এর কোনো প্রচার নেই এবং এত ব্যাপক একটা আন্দোলনের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি বিস্মৃতপ্রায়। প্রচারের এমনই মহিমা যে 'ভাষা আন্দোলন'— কথাটা শুনলেই আমাদের মনে পড়ে যায় পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার কথা। তার প্রতিবাদে বাংলাভাষী পাকিস্তানি এবং উর্দুভাষী পাকিস্তানিদের সংগ্রামের কথা পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি যতটা জানে, বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা আন্দোলন বা মানভূম ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে ঠিক ততটাই কম জানে। এটা আমাদের জাতীয় লজ্জা। নিজের মাটিতে হওয়া বাংলা ভাষার লড়াইকে মর্যাদা না দিয়ে অন্য দেশের ভাষার লড়াই নিয়ে আমাদের মাতামাতি বেশি। কেন মনে রাখব না যে এই রাজ্যের একদম পশ্চিমপ্রান্তীয় জেলা পুরুলিয়াতে বাংলা ভাষা রক্ষার্থে সবচেয়ে দীর্ঘ আন্দোলনটি হয়েছিল? কেন জোর গলায় বলব না যে বাংলাদেশ নয়, সবার প্রথম বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন হয় আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই?

ভাষা বিকৃতি

পশ্চিমবঙ্গে	বাংলাদেশ	Translation
নমস্কার	আসসালাম আলাইকুম	hello
নিমন্ত্রণ	দাওয়াত	invitation
জল	পানি	water
স্নান	গোসল	bath
দিদি	আপু	sister/ elder sister
দাদা	ভাই	brother/ elder sister[72]
মাসি	খালা	maternal aunt
পিসি	ফুফু	paternal aunt
কাকা	চাচা	paternal uncle

১৯০৫ সালে যখন বঙ্গপ্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত এবং বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা হয় তখন সমগ্র বঙ্গ জুড়েই প্রবল প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকায় ব্রিটিশ সরকার খানিক চাপে পড়েই এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। সমগ্র বঙ্গ ভাগ হওয়া থেকে রক্ষা পেলেও ১৯১২ সালে প্রদেশটিকে দু' ভাগ করে দুটি প্রদেশ তৈরি করে ব্রিটিশ সরকার : বঙ্গপ্রদেশ এবং বিহার-ওড়িশা প্রদেশ। এই ভাগাভাগির ফলস্বরূপ বাঙ্গালি অধ্যুষিত মানভূম জেলাটি (বর্তমান পুরুলিয়া জেলা) অন্তর্ভুক্ত হয় বিহার-ওড়িশা প্রদেশের। তারপর থেকেই 'মানভূম জেলাকে বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে' এই দাবি নিয়ে ওই জেলার বাঙ্গালিরা আন্দোলন করতে শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের বিদায় এবং ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতেও পরিস্থিতির বদল হয় না। মানভূম জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তে স্বাধীন ভারতের বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪৮ সালে তৎকালীন বিহার সরকারের একটি নির্দেশ এই ভাষা আন্দোলনকে আরও আক্রমণাত্মক করে তোলে। সেই সরকারি নির্দেশে মানভূম জেলার প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে বাংলাভাষার পঠনপাঠন তুলে দেবার আদেশ দেওয়া হয়। বাংলাভাষার এই অপমানে মানভূমের বাঙ্গালিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং আন্দোলনের অস্ত্র হয়ে ওঠে বিভিন্ন টুসু গান। টুসু তৎকালীন মানভূম তথা বর্তমান পুরুলিয়া জেলার লোকগীতি হিসেবে বিখ্যাত। 'বাংলাভাষা প্রাণের ভাষা রে, মারবি তোরা কে রে?/ এই ভাষাতেই কাজ চলেছে, সাত পুরুষের আমলে।/ এই ভাষাতেই মায়ের কোলে, মুখ ফুটেছে মা বলে...' বা 'শুন্ বিহারি ভাই, তোরা রাখতে লারবি ড্যাং দেখাই।/ তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি, বাংলাভাষায় দিলি ছাই...'— এই রকম বেশ কিছু জনপ্রিয় টুসু গানের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মানভূম জেলায়। ১৯৫৪ সালে এই আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করে। অনেক অত্যাচার সহ্য করলেও মানভূমের বাঙ্গালিদের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবি থেকে একচুলও নড়ানো যায়নি। অবশেষে ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গঠিত রাজ্য-পুনর্গঠন কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে এবং সেই রিপোর্ট অনুসারে ১৯৫৬ সালে ১ নভেম্বর মানভূম জেলা 'পুরুলিয়া' নামে পরিচিত হয় এবং একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতের প্রথম এই ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ অতুলচন্দ্র ঘোষ, ভাবিনী মাহাতো, ভজহরি মাহাতো ও লাবণ্যপ্রভা ঘোষ আজ ভারতীয় তথা বাঙ্গালির স্মৃতিতে কোথাও নেই।

একটু তলিয়ে দেখলেই টের পাওয়া যায়, আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সমগ্র পৃথিবীতে বাংলাভাষার একটা নতুন পরিচয় তৈরি করছে। এ সম্পর্কে আমরা সনাতন বাঙ্গালিরা একেবারেই ওয়াকিবহাল নই। আমরা জানিই না যে বাকি বিশ্বের কাছে বাংলাভাষা ও বাঙ্গালির পরিচয় পালটে গেছে। প্রায় সমস্ত উন্নত বা অনুন্নত দেশেই কোনো ব্যক্তি 'বাঙ্গালি' পরিচয় দিলে প্রথমেই তাকে বাংলাদেশি ভাবা হয়। 'বাংলা' এই শব্দটির সঙ্গে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। 'যাহাই বাংলা তাতেই বাংলাদেশি'— এই ভুল ধারণা যে ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে সে সম্পর্কে আমরা ভারতীয় বাঙ্গালিরা ভাবতে এখনও নারাজ। অথচ এর ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আমরাই হতে চলেছি। পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশে বাংলাদেশিরা অবৈধ উপায়ে প্রবেশ করে। এবং জেহাদ, চোরাকারবার ইত্যাদি নানান অপরাধমূলক কাজকর্মে যুক্ত থাকে। আর তাই ইউরোপ, আমেরিকা ও আরব দেশগুলিতে বাংলাদেশি মুসলমানদের অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখা

ঢাকায় বিবিসি বাংলার অফিস।

হয়। এবারে যেহেতু বাঙ্গালি ও বাংলাদেশি বাকি বিশ্বের কাছে একই কথা, ফলে বাকি বিশ্বে বাঙ্গালি পরিচয় দিলে সনাতন বাঙ্গালিদেরও গোটা পৃথিবী অবিশ্বাসের দৃষ্টিতেই দেখবে। আরব দেশগুলোতে চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদি অপরাধে যতজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশিদের আরবরা রীতিমতো আপদ বলে মনে করে এবং আশঙ্কার কথা আরবরাও মনে করে বাঙ্গালি মানেই বাংলাদেশি। যে কারণে আরব দেশগুলোতে কাজ করতে যাওয়া হিন্দু বাঙ্গালিরা নিজেদের জাতি পরিচয় সভয়ে লুকিয়ে রাখেন। যাতে বাংলাদেশিদের অপকর্মের দায়ে তাঁদের অযথা হয়রানির মধ্যে না পড়তে হয়। ভারতের প্রতিবেশী দেশ বর্মা বা মায়ানমার। সে দেশের রাখাইন প্রদেশ রোহিঙ্গাদের কুকর্মে জর্জরিত। রোহিঙ্গারা আসলে চট্টগ্রামের বাংলাভাষী মুসলমান। রাখাইন প্রদেশে হিন্দু বাঙ্গালিও আছেন কিছু, তবে রোহিঙ্গাদের থেকে সংখ্যায় কম। মায়ানমারের বর্মী মানুষজন রোহিঙ্গাদের 'বাঙ্গালি' বলেন আর হিন্দু বাঙ্গালিদের বলেন 'হিন্দু'। ভাষা এক রাখার ফলে অদ্ভুত পরিচয় সংকট সৃষ্টি হয়েছে আমাদের। সনাতন কথার অর্থ চিরকালীন। সনাতন বা হিন্দু বাঙ্গালিরাই এই বঙ্গভূমির আদি বাসিন্দা। এই ভূমে আমাদের বাস অন্তত ৫০০০ বছর ধরে। অথচ মাত্র ৫০ বছর আগে সৃষ্টি হওয়া বাংলাদেশের দাপটে আমাদের ভাষা ও জাতি পরিচয় বেদখল হতে বসেছে।

শুধু তাই-ই নয়, ভাষা এক থাকার ফলে অর্থনৈতিক ও পেশাগত দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হিন্দু বাঙ্গালি। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোর অনেকেরই একটি বাংলা সংস্করণ আছে। উদাহরণ হিসেবে ব্রিটেনের বিবিসি বাংলা, আমেরিকার সিএনএন বাংলা বা ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা, জার্মানির ডয়চে ভেলে বাংলা ইত্যাদির নাম করা যায়। দুঃখের ব্যাপার হলো, এদের বাংলা শাখাগুলোর সবই হচ্ছে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক। অর্থাৎ এই বাংলা শাখাগুলিতে কর্মরত সাংবাদিক, সম্পাদক, নীতি নির্ধারক ও অন্যান্য সমস্ত কর্মীর প্রায় পুরোটাই নিয়োগ হয় বাংলাদেশ থেকে। শুধু তাই নয়, আজকাল বহু হলিউড ও বিদেশি সিনেমা, সিরিয়াল, নাটক ও ভিডিয়োর বাংলা অনুবাদ করা হচ্ছে বা বাংলা সাবটাইটেল তৈরি করা হচ্ছে। এসব অনুবাদ ও সাবটাইটেল তৈরির কাজও পেয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশিরাই। আর এসবই হচ্ছে 'বাংলাদেশের ভাষা বাংলা' এই অপপ্রচারের জোরে। এর বিরুদ্ধে আমরা হিন্দু বাঙ্গালিরা কোনো জোরালো প্রতিবাদ বা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন— কিছুই গড়ে তুলতে পারিনি। এর ফলে হিন্দু বাঙ্গালিরা এক বিপুল

ভারতীয় রিয়ালিটি শোয়ে ভারত-বিদ্বেষী

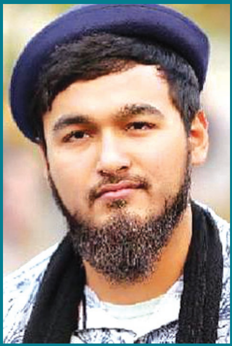

ভারতীয় রিয়ালিটি শো সা রে গা মা পা-য় তৃতীয় স্থান পেয়েছিলেন বাংলাদেশের গায়ক নোবেল। প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর নোবেল বলেছিলেন, 'প্রিন্স মামুদের লেখা বাংলাদেশ গানটি রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলার থেকে ঢের ভালো।' কোন যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেল, প্রশ্ন তুলেছিলেন তাই নিয়েও। তাঁর আর একটি মন্তব্য, 'মোদী চাওয়ালা'।

নোবেল যে ভারত-বিদ্বেষী এই ঘটনা তার প্রমাণ।

অতুলচন্দ্র ঘোষ

ভাবিনী মাহাতো

ভজহরি মাহাতো

কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা ক্রমশ বর্তমান প্রজন্মকে বাংলাভাষা বিমুখ করে তুলছে। কোনো একটি ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে সর্বপ্রথম দরকার সেই ভাষায় কাজের সুযোগ দিয়ে সমাজে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি করা। কিন্তু বাংলাদেশ যত বাংলাকে তার একান্ত নিজের করে গড়ে তুলছে, ততই যেন ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষা গুরুত্ব হারাচ্ছে।

এর বিপুল প্রভাব এসে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। কলকাতার টেলিভিশনে বিভিন্ন রিয়েলিটি শো, গানের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি দর্শকদের আকর্ষণ করার জন্য বেশি বেশি বাংলাদেশি বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানে বাংলদেশি প্রতিযোগীদের নিয়মিত ডাকা হচ্ছে। বাংলাদেশের দর্শক ধরতেই বোধহয় জোর করে রিয়েলিটি শো-এর তিনটে পুরস্কারের মধ্যে একটি বা দুটি বাংলাদেশি প্রতিযোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা সিরিয়ালগুলোতে বাংলাদেশি অভিনেতা ঢুকছে, বাংলা সিনেমায় বাংলাদেশি নায়িকারা সুযোগ পাচ্ছেন। অথচ টালিগঞ্জের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি পুরোটাই হিন্দু বাঙ্গালির অবদান। এতে সুযোগ পাবার অধিকার পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালির সঙ্গে অসম, ত্রিপুরা, আন্দামান ও ঝাড়খণ্ডের বাঙ্গালির থাকা উচিত। বাংলাদেশিদের জন্য তো ঢালিউড আছে, ঢাকা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। একই ভাষার মাহাত্ম্য এখন এমন চরমে পৌঁছেছে যে রবীন্দ্র সংগীত গাইতেও বাংলাদেশ থেকে শিল্পী ভাড়া করে আনতে হচ্ছে। ঢাকা থেকে নাটকের দল না এলে কলকাতা, শিলিগুড়িতে সফল নাট্য উৎসব করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে ভারতের বাংলা বই বিক্রিতে লিখিত-অলিখিত একটা নিষেধাজ্ঞা আছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বইমেলা বাংলাদেশের প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের পুজোসংখ্যাতে ওদেশের লেখকদের লেখা ছাপা হয়, আমাদের কবিতা উৎসবে ওদেশের কবিরা ডাক পান। এত সব করা হচ্ছে কীসের আশায়, কীসের মোহে? নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কেন এই অকারণ বাংলাদেশি তোষণ?

মানভূম ভাষা আন্দোলন।

আমাদের সমস্যা শুধু এটুকুতেই শেষ নয়। গুগল বা ফেসবুকেও ইংরেজি থেকে অনেক ভাষারই সরাসরি অনুবাদের সুবিধা আছে। এর সুবাদে যে কোনো বিদেশি গুগল বা ফেসবুকের অনুবাদ পড়ে পড়েই শিখে ফেলতে পারেন বাংলা-সহ বিশ্বের যে কোনো ভাষা। কিন্তু গুগলে বাংলার স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ হিসেবে বাংলাদেশি বাংলার রমরমাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা ভারতীয় বাঙ্গালিরা তারপরও নিরুত্তাপ। যেমন— ইংরেজি শব্দ 'Sister'-এর বাংলা অনুবাদ 'দিদি' না 'আপু' তা একজন বিদেশির কাছে অজ্ঞাত। 'দিদি' খাঁটি বাংলা শব্দ হলেও 'আপু' কিন্তু বিদেশি শব্দ। অথচ বাংলাদেশের বদান্যতায় এখন গোটা পৃথিবী শিখছে Sister-এর বাংলা হলো 'আপু'। Greetings-এর বাংলা আর 'নমস্কার' নেই, হয়ে গেছে 'আদাব'! Pray হয়েছে 'দোয়া', water হয়েছে 'পানি' আর grandmother হয়েছে 'নানি'! আজ্ঞে হ্যাঁ, গোটা পৃথিবী এখন এই আরবি-ফার্সি অধ্যুষিত বাংলাদেশি বাংলাকেই প্রকৃত বাংলা হিসেবে চিনছে। উইকিপিডিয়ার মতো বিশ্বকোষেও হিন্দু বাঙ্গালিরা কোণঠাসা। বিশ্বের সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ সমেত প্রবন্ধ থাকে উইকিপিডিয়াতে। অথচ বাংলা উইকিপিডিয়ার প্রায় সমস্ত প্রশাসক বাংলাদেশি। তাদের অঙ্গুলিহেলনেই ঠিক হয় বাংলা উইকিতে কোন প্রবন্ধ জায়গা পাবে আর কোনটা নয়। বাংলাদেশের জন্য জরুরি বিষয় সেখানে প্রাধান্য পায় আর হিন্দু বাঙ্গালির কাছে দরকারি জিনিস হয় অবহেলিত।

অর্থাৎ এই এক ভাষা হবার কারণে, আন্তর্জাতিক সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা জায়গা হারাচ্ছি। সবরকম ভাবে আমাদের সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হয়েছে। তাই শুধু 'বাংলা' ভাষার পরিবর্তে কোনটি 'সনাতন বাংলা' বা 'আদি বাংলা' এবং কোনটি 'বাংলাদেশি বাংলা' সেটি নির্দিষ্টকরণের সময় এসেছে। ১৯৪৭ সালে বঙ্গভূমি ভাগ হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বকে মান্যতা দিতে গিয়ে। এখন আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করেই ঠিক করতে হবে, বাংলা ভাষা শুদ্ধ রাখা কতটা যুক্তিসঙ্গত। অন্যথায় হয়তো অদূর ভবিষ্যতে অবিভক্ত বঙ্গের 'আদি বাংলা' ভাষা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে সেই স্থান দখল করবে বাংলাদেশি বাংলা ভাষা। মনে রাখতে হবে, সতর্কতাই সুরক্ষার ভিত্তি। তাই, সময় থাকতে উদ্যোগী হওয়া ভালো। ■

বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভাষার ভূমিকা যৎসামান্য

মিতালি মুখার্জী

দ্বিজাতিতত্ত্বের অনুপ্রেরণায় বাংলাভাষার আরবিকরণ শুরু হয়েছিল পাকিস্তান গঠনের সময় থেকে। চেষ্টা চলছিল 'ইসলামি বাংলা' তৈরির, যার পুরোধা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীরাই। বিখ্যাত ভাষাবিদ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তো এক ধাপ এগিয়ে বলে গেছেন যে মুসলমানের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত আরবি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ আরবির দাবি মানতে মোটেই রাজি ছিলেন না। কারণ এতে করে পশ্চিম পাকিস্তানি এবং পূর্ব পাকিস্তানি, দুজনেই শিক্ষা, চাকরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সম-অবস্থানে চলে আসতেন। কারণ আরবি শেখা বাংলাভাষী ও উর্দুভাষী উভয়ের পক্ষেই একই রকম কঠিন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের দাবি অনুসারে বাংলাভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। তারপর থেকেই পাকিস্তানে দুটি সরকারি ভাষা প্রণীত হয়, বাংলা ও উর্দু।

তাহলে ১৯৫৬-তে ভাষাগত বিরোধের সমাধান হয়ে যাবার পরেও ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের দরকার পড়ল কেন? ভাষার জন্যই যদি পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে আলাদা হয়ে বাংলাদেশের সৃষ্টি, সেটা তবে ১৯৫৬-র আগেই হতে পারত। আসল দাবি ছিল অর্থনৈতিক। সেজন্যই ১৯৬৬-র ৬ দফা দাবি অন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী নেতৃত্ব যেসব বিষয় নিয়ে লড়ছিলেন, তার পুরোটাই ছিল অর্থনৈতিক ও সামরিক। ভাষাগত দাবির নামগন্ধ তাতে ছিল না। কারণ সেই সমস্যা ৫৬-তেই মিটে গেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শেখ মুজিবের সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সে আশা পূরণ হলে পাকিস্তান ভাগ হতো কিনা বলা মুশকিল। তবে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ সৃষ্টির পিছনে ভাষার ভূমিকা খুবই সামান্য। এমনকী বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে যেসব শহিদের নাম করা হয়, তাদের ভূমিকাও খুব সন্তোষজনক নয়। ভাষা শহিদ বলতেই উঠে আসে যে কটি নাম, তারা হলেন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার ও শফিউর রহমান। সকলেই নিহত হন একই সনে, একই দিনে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। তবে এদের মধ্যে প্রথম দুজন ছাড়া বাকিরা কেউই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে নিহত হননি। আব্দুল জব্বার যেমন শাশুড়ির ক্যানসার রোগের ওষুধ কিনতে এসেছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে। ওই সময়ে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পাকিস্তানি পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালানো শুরু করলে, দুর্ভাগ্যবশত জব্বারের গায়ে গুলি এসে লাগে। শফিউর রহমান ওই সময়েই সাইকেলে করে অফিস যাচ্ছিলেন, ঠিক আর পাঁচটা দিনের মতো। গণ্ডগোলের মধ্যেই গুলির

> আমরা একুশে চিনেছি, রফিক-সালাম-বরকতের নাম শুনেছি। কিন্তু মনে রাখিনি উনিশে মে, ভুলে গিয়েছি বিশে সেপ্টেম্বর, অস্বীকার করেছি ১ নভেম্বর।

কমলা ভট্টাচার্য, কানাইলাল নিয়োগী, তরণীচন্দ্র দেবনাথ, শচীন্দ্র পাল, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সুনীল সরকার

সুকোমল পুরকায়স্থ, হিতেশ বিশ্বাস, কুমুদরঞ্জন দাস, সত্যেন্দ্র দেব, বীরেন্দ্র সূত্রধর

বরাকের ভাষা যোদ্ধারা।

ফঃ ৪

ঘায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজেরই হোস্টেলে থাকতেন আবুল বরকত। এই গুলিগোলার আওয়াজ শুনে হোস্টেলের বারান্দায় বেরিয়ে কী হচ্ছে দেখতে গেছিলেন, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাঁরও শরীর পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ হয়। এদের মৃত্যু দুঃখজনক হলেও নিতান্তই কাকতালীয়। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তেমন কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবুও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শহুরে শিক্ষিত নব্য আঁতেলের দল রফিক-সালাম-বরকত-জব্বার- শফিউরের আবেগে ভাসতে থাকে। সরকারি ভাবে এই আবেগের ব্যাপক প্রচার করারই ফল পেয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৯৯-এ এই ২১-এ ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো।

কিন্তু মুশকিল হলো, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। একুশের ভেলায় ভেসে আমরা ভুলে গেলাম তার আগের ইতিহাস, আমাদের নিজেদের ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস। মানভূমের ভাষা আন্দোলন শুরু হয় ১৯১২ সালে। সব থেকে সুদীর্ঘ ভাষা আন্দোলনের সাক্ষ্য নীরবে বহন করছে এই মানভূম। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চল থেকে সুপরিকল্পিত ভাবে বাংলাভাষা মুছে দেবার চেষ্টার প্রতিবাদে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে মানভূমের বাঙ্গালিদের অসন্তোষ দেখা দেয় ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই। ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র মানভূম ও ধলভূম জেলাকে নতুন তৈরি বিহার-ওড়িশা রাজ্যের অন্তর্গত করা হয়। বাঙ্গলাকে এভাবে টুকরো টুকরো করার বিরুদ্ধে ওই অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ জানালেও কোনো লাভ হয়নি। ১৯০৫-এ না হলেও ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো তীব্র বাংলা বিদ্বেষ। একের পর এক বাংলা স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। সমস্ত সরকারি অফিসে বাংলা হলো নিষিদ্ধ। এর বিরুদ্ধেই শুরু হলো মানভূমের ভাষা আন্দোলন। সতীশ চন্দ্র সিংহ পালামৌ, মানভূম ও সিংভূম জেলা নিয়ে ছোটনাগপুর নামে এক নতুন প্রদেশ গঠন ও বাঙ্গলার সঙ্গে সংযোজনের প্রস্তাব দিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। ব্যারিস্টার পি. আর দাসের সভাপতিত্বে 'মানভূম সমিতি' নামের সংগঠন তৈরি করে সম্পূর্ণ গণ-উদ্যোগে প্রাথমিক স্তরের বাংলাস্কুল খুলে তাতে বাংলায় শিক্ষাদান শুরু হয়। বিহার সরকার বাংলা ভাষার জন্য সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করলে মানভূম জেলার আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। বিরোধ চরমে ওঠে ১৯৪৮-এর ৩০ ও ৩১ মে। অতুল চন্দ্র ঘোষ, বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত, সত্যকিঙ্কর মাহাতো, ভীমচন্দ্র মাহাতো, ভজহরি মাহাতো, লাবণ্য প্রভা ঘোষ ও তাঁর অন্যতম সহযোগী ভাবিনি মাহাতো--- এরা ছিলেন এই আন্দোলনের পথিকৃৎ। এই সময় টুসু সংগীত ও টুসু আন্দোলনের মাধ্যমে এই বাংলাভাষা আন্দোলন এক আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। তার মধ্যে একটি হলো—

'শুন বিহারি ভাই
তোরা রাখতে লারবি ডাং দেখাই,
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।'

এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ মানভূম জেলা থেকে বাঙ্গালি অধ্যুষিত অংশ নিয়ে 'পুরুলিয়া' নামে এক নতুন জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্য কোনো জাতি হলে হয়তো পুরুলিয়া একটা ভাষাতীর্থে পরিণত হতো। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা পুরুলিয়ার মরণপণ লড়াইয়ের কথা মনে রাখিনি।

এর পরের ঘটনা ১৯৬১-র ১৯-এ মে। অসমের বরাক উপত্যকার বাঙ্গালিদের কাছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাস। ১৯৬০-এর এপ্রিলে এই সংগ্রাম শুরু হয় মূলত অসম সরকারের চাপিয়ে দেওয়া ভাষা বিলের আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে। যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৯৬১-র ১৯-এ মে অসমের কাছাড় জেলার শিলচর শহরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ১১ জন গর্বিত বাঙ্গালি। চারিদিকে তখন 'বঙ্গাল খেদা'র রব-কে অগ্রাহ্য করে শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিল করছিলেন ভাষাবিপ্লবীরা। শিলচর স্টেশনও ঘেরাও করা হয়। ট্রেনের একটা টিকিটও সেদিন বিক্রি হয়নি। এরপর পুলিশ এসে গ্রেপ্তার শুরু করে এবং বিক্ষোভকারীরা বাধা দিলে শুরু হয় পুলিশের গুলি বর্ষণ। লুটিয়ে পড়ে ১১টি তাজা প্রাণ যার মধ্যে ছিল কমলা ভট্টাচার্য নামের এক কিশোরী। সেদিন যাঁরা মৃত্যুবরণ করে চির অমর হয়েছিলেন তাঁরা হলেন কমলা ভট্টাচার্য, কানাইলাল নিয়োগী, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, হিতেশ বিশ্বাস, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্র পাল, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, কুমুদরঞ্জন দাস, সত্যেন্দ্র দেব ও বীরেন্দ্র সূত্রধর। এই আন্দোলনের ফলেই অসম রাজ্যের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় বাংলা।

তবে এতেই শেষ নয়, বাঙ্গালির নিজের মাতৃভাষার জন্য প্রাণদান। ২০১৮-র বিশে সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনাও সেই গভীর ষড়যন্ত্রেরই স্বরূপমাত্র যেখানে দরকার না থাকা সত্ত্বেও জোর করে ঢোকানো হচ্ছিল দুজন উর্দু শিক্ষককে। স্কুলে দরকার ছিল ইংরেজি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতের শিক্ষক। কিন্তু উর্দু আগ্রাসন নীতির হাত ধরে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়োগ করা হলো দুজন উর্দু শিক্ষক। সেদিনটা ছিল স্কুলের ছুটির দিন। কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সেদিন স্কুল খোলা রাখা হলো যাতে সবার অলক্ষ্যে ওই দুজন উর্দু শিক্ষককে যোগদান করানো যায়। প্রতিবাদী ছাত্রদের দমন করতে তৈরি ছিল অস্ত্র সজ্জিত পুলিশ বাহিনী। প্রতিবাদ যখন ব্যাপক আকার নিল, তখন ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চালানো হলো প্রথমে কাঁদানি গ্যাস, মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া হলো, ছিড়ে দেওয়া হলো তাদের পোশাক পরিচ্ছদ। নীচু শ্রেণীর ছাত্রদের তুলে তুলে আছাড় মারা হলো। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি শুরু করলে হঠাৎই গর্জে উঠল পুলিশের বন্দুক। প্রাণ দিতে হলো তরুণ ভাষাবীর রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মণকে। তাদের চিকিৎসার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরে থাক যখন বাড়ির লোক তাদের নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল তখন মাঝপথে তাদের উপর আক্রমণ করা হয় দা, লাঠি ও বল্লম নিয়ে। কোনওমতে হাসপাতালে পৌঁছানোর পরও কোনো অদৃশ্য কারণে চিকিৎসাই হলো না তাদের। অকালে ঝরে গেল দুটি তাজা প্রাণ। তবে যাবার আগে তরুণ তাপস বলে গেছে তার শেষ কথা। 'যে লড়াই আমরা শুরু করলাম তা যেন ব্যর্থ না হয়।' এই বিশে সেপ্টেম্বর আজও 'পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পাবার আশায় লড়ছে।

ইতিহাস সাক্ষী, মাতৃভাষার জন্য লড়াইতে বাঙ্গালি কখনো পিছিয়ে থাকেনি। যখন যেখানে দরকার পড়েছে, বাঙ্গালি প্রাণ দিয়েছে এবং তারপরেও লড়েছে। বাঙ্গালি শুধু ভুল করেছে একটা জায়গায়। নিজেদের সংগ্রামের কথা বড়োমুখ করে সে বলেনি, ফলাও করে প্রচার করেনি। তাই আমাদের নিজেদের লড়াইগুলো আমাদেরই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। আমরা একুশে চিনেছি, রফিক-সালাম-বরকতের নাম শুনেছি। কিন্তু মনে রাখিনি উনিশে মে, ভুলে গিয়েছি বিশে সেপ্টেম্বর, অস্বীকার করেছি ১ নভেম্বর। দেরিতে হলেও আজ প্রশ্নটা করতে হবে। বাঙ্গালির তো উনিশে আছে, বিশে আছে, পয়লা আছে, তাহলে একুশে পালন করব কেন? □

সুকিয়া স্ট্রিটের আখড়ায় বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের জন্মদিন উদ্‌যাপন

ক্রীড়া ভারতী দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে এবং পুলিন বিহারী স্মৃতি স্মারক সমিতির সহায়তায় কলকাতার ৯নং বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের আখড়ায় গত ২৮ জানুয়ারি বিপ্লবী মহাগুরু পুলিনবিহারী দাসের জন্মদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক অগ্নিমিত্র চক্রবর্তী, ইতিহাস সংকলন সমিতির অমিতাভ সেন। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ১/১/২ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কলকাতা-৯-এর বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি নামক আখড়াটিতে এতদ্‌ অঞ্চলের বালক, কিশোর, যুবকরা দীর্ঘদিন ধরে লাঠিখেলা, যুযুৎসু, ক্যারাটে, যোগব্যায়াম প্রভৃতি শরীরচর্চা ও আত্মরক্ষামূলক শিক্ষা গ্রহণ করত। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে 'আনন্দমঠ', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' প্রভৃতি নাটক পরিচলনা এবং দেশাত্মবোধক গান, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, সাহসিকতা, সততা ও দেশাত্মবোধ জাগরণের কাজ করে

চলেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৯০ সালে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠানটি দখল করে নেয় এবং সর্বপ্রকার কার্যকলাপ বন্ধ করে একটি ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প চালু করে।

প্রতিষ্ঠানটির সদস্য ও এলাকার মানুষের এবিষয়ে ক্ষোভ থাকলেও প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। বর্তমান শাসকদল ও কলকাতা করপোরেশন ওই স্থানটিতে একটি কমিউনিটি হল বানিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাড়া দিচ্ছে, যা এই স্থানের পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর। এদিনের অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষ দাবি তোলেন, (১) ওই স্থানে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম চর্চার কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। (২) বর্তমান ক্ষীণবল বঙ্গীয় যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীদের জন্য লাঠিখেলা এবং আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (৩) অবিলম্বে বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের স্মৃতি রক্ষার্থে স্থানটি অধিগ্রহণ করে তার ঐতিহাসিক মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং (৫) বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের মর্মরমূর্তি স্থাপন করতে হবে।

দক্ষিণ কলকাতার সন্তোষপুরে কম্বল বিতরণ ও স্বাস্থ্য শিবির

দক্ষিণ কলকাতার সন্তোষপুরের 'গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' ও তার অধীনস্থ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য গঠিত 'অনুভূতি সেবাকেন্দ্র'-এর উদ্যোগে সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমার জয়নগর মৌজার কুলতলি ব্লকের কাটামারি গ্রামে একটি কম্বল বিতরণ ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংস্থার সম্পাদক অমল কর্মকারের পরিচালনায় কম্বল বিতরণ করা হয়। সঙ্গে ছিলেন সংস্থার সদস্য সুস্মিতা চ্যাটার্জি, সুপর্ণা মজুমদার, কাজল বসু, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির পরিচালনা করেন স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ সতনু রায়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক সুময় মণ্ডল ও বিশ্বনাথ মণ্ডল।

দক্ষিণবঙ্গ আরোগ্য ভারতীর আরোগ্য প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি দক্ষিণবঙ্গ আরোগ্য ভারতী কলকাতা শাখার উদ্যোগে কলকাতার বিখ্যাত যোগ প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থায় আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতীর রাজ্য সভাপতি দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. অভিজিৎ ঘোষ, সম্পাদক ডাঃ আশিস ব্যানার্জি, পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক বুদ্ধদেব মণ্ডল, পূর্বক্ষেত্র সহ সম্পাদক রাজেশ কর্মকার প্রমুখ। প্রশিক্ষণ বর্গে হোমিয়োপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক ও অ্যালোপ্যাথি বিভাগের ৮০ জন চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য সামাজিক সংগঠন আরোগ্য ভারতী ২০০৪ সালে থেকে সমগ্র ভারতে সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নতি ও সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্য নিয়ে পথ চলা শুরু করে। প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত মণিমুক্তা সংগ্রহ করে মালা গেঁথে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আরোগ্য ভারতীর ব্রত। 'ধর্মার্থকামমোক্ষণাং আরোগ্যম্ মূলমুত্তমম্'— এই আদর্শ সামনে রেখে 'স্বস্থস্য স্বাস্থ্যসংরক্ষণম্ আতুরস্য রোগ প্রশনম্' লক্ষ্য পূরণে ব্যক্তি থেকে সমষ্টি, গ্রাম থেকে শহরে আরেগ্য ভারতী কর্মকর্তারা কর্মরত। আরোগ্য ভারতীর কর্মবিস্তারে সবচেয়ে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁরা হলেন আরোগ্য মিত্র। আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ বর্গে যোগ, আয়ুর্বেদ, প্রাথমিক চিকিৎসা, ঘরোয়া উপাচার, হোমিয়োপ্যাথি, সুস্থ জীবনশৈলী প্রভৃতির হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষিত আরোগ্য মিত্ররা মাসিক মিলনের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ ও সমৃদ্ধ করে তোলেন এবং গ্রামে গ্রামে শিবির আয়োজনের মাধ্যমে দেশবাসীকে স্বাস্থ্যসচেতন করে তোলার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন।।

মালদার পরানপুরে আগরওয়াল ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্বস্ব দান

মালদা জেলার চাঁচোল মহকুমার পরানপুরের বাসিন্দা ব্যবসায়ী অমরচাঁদ আগরওয়াল ও বজরংলাল আগরওয়াল দুই সহোদর তাঁদের প্রয়াত মায়ের ইচ্ছায় নিজেদের আদি বাসস্থানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি-সহ ৪২ শতক জমি দান করলেন গ্রামেরই দুর্গাপূজা কমিটির হাতে। সেই উপলক্ষ্যে গত ৬ ফেব্রুয়ারি পরানপুর হাইস্কুলের কাছে দুর্গামন্দির সংলগ্ন মাঠে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা কেন্দপুকুর এলাকার সারদা আশ্রমের অধ্যক্ষ গিরিজাত্মানন্দজী মহারাজ, পরানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অজিত কুমার দাস। দাতাদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে আশেপাশের ২০-২২টি গ্রামের বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাপূজা কমিটির সভাপতি গজানন্দ আগরওয়াল ও সম্পাদক প্রভাস সরকার দাতাদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, একটি ট্রাস্ট গঠন করে দানের জমিতে গোশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, দুঃস্থ পড়ুয়াদের জন্য ছাত্রবাস এবং অবৈতনিক কোচিং সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। দাতা অমরচাঁদ আগরওয়াল বলেন, মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম বলে খুব আনন্দ হচ্ছে।

ডিজিটাল স্বস্তিকার পথ চলা শুরু

তিয়াত্তর বছরের ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা সমৃদ্ধ স্বস্তিকা পত্রিকার ডিজিটাল বিভাগ শুরু হলো গত ২৯ জানুয়ারি। এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রক সারদাপ্রসাদ

পাল, সম্পাদক ড. তিলক রঞ্জন বেরা, পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, ট্রাস্টি অরিন্দম সিংহরায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, প্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাত প্রমুখ। সমাজসেবী ও ডিজিটাল মিডিয়ায় দক্ষতাসম্পন্ন চন্দ্রচূড় গোস্বামী ও শ্রীমতী অনামিকা দে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

যুগদ্রষ্টা স্বামী প্রণবানন্দ ও বাঙ্গালি হিন্দু

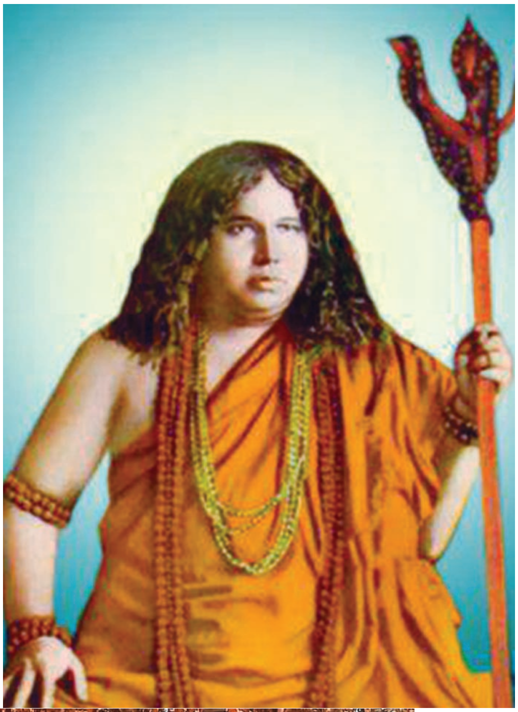

বিজয় আঢ্য

যুগদ্রষ্টা স্বামী প্রণবানন্দ অনুভব করেছিলেন— ভারতবর্ষ হিন্দুর আবাসভূমি হওয়া সত্ত্বেও বারবার এ দেশের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তরণ করা হচ্ছে। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মযাজক, পাদরিকুলও সাহায্যের নামাবলী গায়ে দিয়ে হিন্দুদের ধর্মান্তরণ করেছে। পার্থক্য শুধু এটুকুই— মুসলমান শাসনকালে ছিল জবরদস্তি আর খ্রিস্টানদের ছিল সেবার প্রলেপ। হিন্দুত্বের ওই সংকটের দিনে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন— 'এসো হিন্দু, সংহতি শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তোমরা হিন্দুর সনাতন আদর্শে শ্রদ্ধাবান হও।' তিনি অনুভব করেছিলেন— হিন্দুকে রক্ষা করতে হলে প্রথমেই তাদের বাঁধতে হবে ঐক্যের বন্ধনে। চাই হিন্দু সংগঠন। সাম্প্রতিক কালে ধর্মান্তরকরণ, অনুপ্রবেশ, ইসলামিক সন্ত্রাস, সর্বোপরি ভোটসর্বস্ব তোষণের রাজনীতি স্বামী প্রণবানন্দের হিন্দু জাগরণের আহ্বানকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

সত্যি কথা বলতে কী, যে উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল, তা ব্যর্থ হতে চলেছে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের পরোক্ষ সমর্থনে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে হিন্দু নির্যাতন, হিন্দু নারীর শ্লীলতাহানি, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙা, হিন্দু মন্দির অপবিত্র করা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। হিন্দু রক্ষার নেতৃত্বের ভার সেসময় তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উপর তুলে দিয়েছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার সদস্য হিসেবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও অনুভব করেছিলেন— কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ রাজনীতি হিন্দুদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে। তাহলে ভারতবর্ষে হিন্দুদের স্বার্থ কে দেখবে?

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকাজ।

দেশভাগের বিনিময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরও হিন্দুরা নির্যাতিত, বিশেষত বাঙ্গালি হিন্দুদের স্বার্থ যে উপেক্ষিত হবে— এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বাঙ্গলা জুড়ে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলির প্রস্তাব মতো ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গপ্রদেশের অ্যাসেম্বলিতে যে ভোটাভুটি হয় তাতে বেশিরভাগ সদস্যই (৫৮-২১) বঙ্গ ভাগের পক্ষে রায় দেন। বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য বাঙ্গলার যে হিন্দু অধ্যুষিত অংশটি ছিনিয়ে নিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ, আজ সেই ভূখণ্ডটির নাম পশ্চিমবঙ্গ। এটা যদি না হতো তাহলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কী অবস্থা হতো তা বর্তমান বাংলাদেশের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার সেদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের (বৌদ্ধ, শিখ, জৈন-সহ) উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। তার ফলে কয়েক কোটি হিন্দু পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা চলে আসেন, আজকে পশ্চিমবঙ্গে যাদের 'বাঙাল' বলা হয়, তারা সবাই এই শ্রেণীর। এরাই হলো শরণার্থী অর্থাৎ ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত হয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হওয়ার (১৯৭১) পরও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার যথেষ্ট হয়ে চলেছে। সাম্প্রতিককালের সংবাদমাধ্যমের উপর দৃষ্টি রাখলেই তা বোঝা যাবে। বাঙ্গালি লেখিকা তসলিমা নাসরিন এই অত্যাচারের কথা লিখেই এদের বিষনজরে পড়েছেন। যারা বাংলাদেশে গেছেন তারা সবাই জানেন—সোয়া কোটি হিন্দু তাড়িয়ে দেওয়ার পরও সেদেশে মানুষ গিজগিজ করছে। এদের বাসস্থান নেই, চাকরি নেই, খাবার সংস্থান নেই। তাই তারা চোরা পথে ভারতে ঢুকছে মানে অনুপ্রবেশ করছে। এদের আসার ফলে অসমের ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলো মুসলমান প্রধান হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে হিন্দুদের থাকা কঠিন হয়ে উঠছে। ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) হিন্দুর অনুপাত কমে বাইশ থেকে আট শতাংশে ঠেকেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সংখ্যার অনুপাত কুড়ি শতাংশ থেকে বেড়ে একত্রিশ শতাংশের কাছাকাছি। জনসংখ্যার ভারসাম্য এভাবে বদলে যাওয়া যে অত্যন্ত বিপজ্জনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২০০৪ সালের ১৪ জুলাই লোকসভায় কংগ্রেস সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জয়সওয়াল জানিয়েছিলেন, ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আছে। তার আগে ১৯৯০ সালে কমিউনিস্ট নেতা, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লোকসভায় বলেছিলেন, ভারতে প্রায় ১ কোটি অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। আর রাজ্যের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর দলীয় মুখপত্র গণশক্তিতে ১১ অক্টোবর, ১৯৯২ সালে লেখা নিবন্ধে স্বীকার করেই নিয়েছিলেন, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে যে বাংলাদেশিদের বিতাড়ন করা হয়েছিল, তার ৭৫ শতাংশই মুসলমান। আর পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৫ সালে তিনি যখন লোকসভার সাংসদ, তখন সংসদ কক্ষে হাতের ফাইল এবং কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ করেন। যদিও এখন তিনি তা অস্বীকার করে বলেছেন, তাঁর প্রতিবাদটা ছিল ভোটার তালিকায় কারচুপির বিরুদ্ধে।

এই অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অবৈধ এবং বেআইনি অসামাজিক কাজকর্ম যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনই অর্থনীতির উপর চাপ পড়ছে। বদলে যাচ্ছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীবিন্যাস। সীমান্তবর্তী এলাকার বহু হিন্দু পরিবার নিজেদের পৈতৃক ভিটেমাটি বিক্রি করে দিয়ে শহরে চলে আসছে। বস্তুত ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের দিকে ১৫-২০ কিলোমিটার এলাকা প্রশাসনিক দিক থেকে ভারতের হলেও সামাজিক সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশ হয়ে গেছে। সেখানে এক মাইল অন্তর মাদ্রাসা পাওয়া যাবে, নমস্কারের বদলে সালাম আলেকুম, জলের বদলে পানি, ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত নিয়ম করে মাইকে আজানের আওয়াজ শোনা যাবে। উত্তর দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী এলাকায় ঘুরে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এটাই।

এইসব দেখে মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গে অবাধ অনুপ্রবেশের পেছনে একটি রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে, যা ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গকে বিপন্ন করে তুলবে। জিন্না ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিয়ে যে আগ্রাসনের রাজনীতিটি চালু করে দিয়ে গিয়েছেন, আজও তা অব্যাহত, কিন্তু তা নীরব এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে পরিকল্পিত। লক্ষণীয়, জন্মহার ও অনুপ্রবেশের কারণে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুধু নয়, মুসলমান ভোটারও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই কারণে মুসলমান অধ্যুষিত নির্বাচনী এলাকাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিধানসভা কেন্দ্রগুলি পুনর্বিন্যাস হওয়ার ফলে কলকাতার বিধানসভা কেন্দ্র ২১ থেকে কমে ১১ হয়েছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে আবার মুসলিম লীগের রাজনীতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর অভিসন্ধি বলে অনেকে মনে করছেন। এই প্রসঙ্গে এক বন্ধুর অভিজ্ঞতার কথা বলছি। সে ও তার একজন মুসলমান বন্ধু সল্টলেকের 'পশ' এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। দুজনেই আশপাশের বাড়িগুলি ও পরিবেশ দেখে মুগ্ধ। আমার বন্ধুটি আমাদের সমাজের বিত্তবানদের রুচির খুবই প্রশংসা করছিল। এসব শুনে বন্ধুর বন্ধুটি বলল, 'যাই বলিস না কেন, এগুলো তো আমরাই ভোগ করবো'। বস্তুত চারপাশে যা ঘটছে তাতে এই সংশয় ক্রমশ বাড়ছে।

২০১৪ সালের ২ অক্টোবর দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীর দিনে বর্ধমান শহরের খাগড়াগড়ে ইসলামি মৌলবাদীদের অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণ, তার সঙ্গে বাংলাদেশের ইসলামি জঙ্গিদের যোগ, এক পরিচিত ইসলামি মৌলবাদীকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাংসদ নির্বাচন—সব মিলিয়ে সংশয় বাড়াটাই স্বাভাবিক। যতদিন যাচ্ছে, অনেক ধরনের খাগড়াগড় ঘটেই চলেছে। মনে হচ্ছে, পুরো পশ্চিমবঙ্গই এখন খাগড়াগড়। ঘটনা হলো, বাংলাদেশি মুসলমানের অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গ তৈরির মূল ভিত্তি হিন্দু জনসংখ্যার আধিপত্যকেই ধ্বংস করতে চাইছে।

আবার শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, পাশের রাজ্য অসমেও হিন্দু বাঙ্গালিরা এখন বিপর্যয়ের মুখোমুখি। স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও অসমে হিন্দু বাঙ্গালি এক ভাসমান ভাষাগত সমাজ। অবশ্য আশার কথা এই, অসমের মানুষ বাংলাদেশি মুসমানদের বোঝা আর বইতে চাইছে না। এটা গত নির্বাচনে তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

অসমের ঘটনা থেকেও কি আমাদের চোখ খুলছে না? এতসবের পরেও ২৯ আগস্ট, ২০১৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল বিধায়কদের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের নতুন নাম হবে বাংলা, হিন্দিতে বঙ্গাল আর ইংরাজিতে বেঙ্গল। প্রশ্ন হলো, মাননীয় বিধায়করা কি ভুলে গেলেন, পশ্চিমবঙ্গ শুধু বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিম অংশ নয়, পশ্চিমবঙ্গ একটি ভাবনা। এই নামটি হিন্দু বাঙ্গালির ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এই নামটি বাদ দিলে বাঙ্গালি হিন্দুদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এত কিছুর পরও কি যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা রুখে দাঁড়াবো না?

(মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

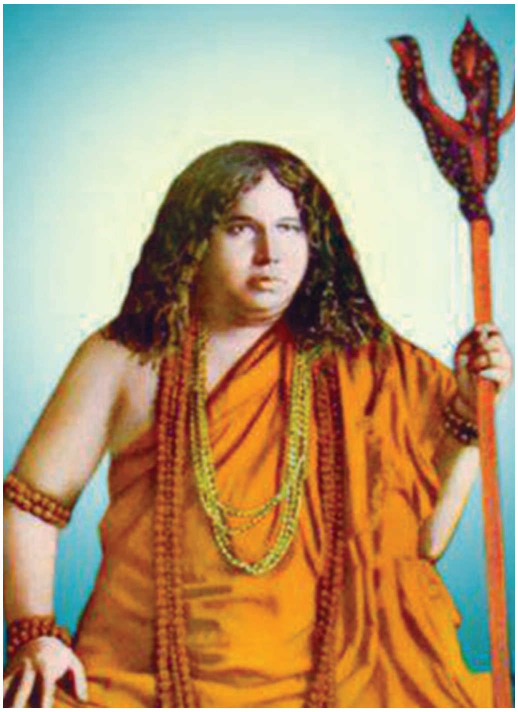

জাতিগঠনের মন্ত্র জপ করতে শিখিয়েছেন স্বামী প্রণবানন্দ

অনীত রায়গুপ্ত

এই সেই দেশ ভারতবর্ষ যেখানে যুগে যুগে মুনি ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেছেন। আধুনিক ভারতবর্ষে যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ তাঁদেরই একজন। ভারতের আধ্যাত্মিক ও সমাজ সেবামূলক আন্দোলনের অগ্রণী 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' তাঁর স্বপ্নের ফসল। যেখানেই বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়, প্লাবন, মহামারী, অতিমারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সেখানেই সবার আগে আর্তজনের সেবায় এগিয়ে আসে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। ভারতের প্রতিটি তীর্থক্ষেত্রেই সঙ্ঘের তীর্থাবাসে তীর্থযাত্রীরা শান্তির আশ্রয় পায়।

এই সাক্ষাৎ শিবাবতার স্বামী প্রণবানন্দ বাংলা ১৩০২ সনের ১৬ মাঘ, বুধবার, শ্রীশ্রী মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বিষ্ণুচরণ ভুঁইয়া এবং মাতার নাম সারদা দেবী। তাঁর ডাকনাম বুধো।

দেশপ্রেমের আগুনে প্রজ্বলিত দূরদর্শী 'বিনোদ সাধু' বুঝেছিলেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আশ্রয়দাত্রী ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে হলে, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি অটুট রাখতে হলে হিন্দুর আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে। দেশগঠন, জাতি গঠন ও মানব কল্যাণের একমাত্র আশ্রয় হিন্দুসমাজ। তাঁর মূল্যবান বাণী— 'হিন্দুর কল্যাণ ভারতের কল্যাণ— মানব জাতির কল্যাণ। হিন্দুর মুক্তিতে ভারতের মুক্তি— সমগ্র মানব জাতির মুক্তি।

ছাত্রাবস্থা থেকেই বালক বিনোদ দেশের যুবকদের নৈতিক দুরবস্থা দেখে অধীর হয়ে উঠতেন। মানব মুক্তির পথ অনুসন্ধানের জন্য গোরক্ষপুরের স্বামী গম্ভীরানাথজীর নিকট শৈবমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে তিনি মহাভাব সমাধিতে দু' বছর অতিবাহিত করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের পুণ্য মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি দিব্য অনুভূতি প্রকাশ করলেন— 'এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহামিলনের যুগ, এ যুগ মহা সমন্বয়ের যুগ, এ যুগ মহামুক্তির যুগ।' পরের বছর ১৯১৭ সালে মাঘী পূর্ণিমায় বাজিতপুরেই গড়ে তুললেন 'বাজিতপুর আশ্রম'। আজকের মহীরুহ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেটিই আদিরূপ। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের এক ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ববঙ্গের বহুগ্রাম বিধ্বস্ত হয়। সেই সময় ব্রহ্মচারী বিনোদ তাঁর সেবাদলকে নিয়ে বিপন্ন মানুষের সেবা ও সহযোগিতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাদারিপুরের জননেতা সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও আরও কিছু বিশিষ্ট লোকজনের দ্বারা গড়ে ওঠা East Bengal Cyclone Relief Committee-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও ভালোবাসায় গড়ে উঠল 'মাদারীপুর সেবাশ্রম।'

মাদারীপুরের সেবাকাজের জের কাটতে না কাটতেই খুলনা জেলার সাতক্ষীরায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ এবং সুন্দরবন অঞ্চলে অজন্মা দেখা দেয়। সব জায়গাতেই সঙ্ঘের সেবকগণ সেবা ও ত্রাণকাজের দ্বারা মানুষের মন জয় করে নেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

এভাবেই বিশ্বজুড়ে আর্ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামীজীরা।

তাঁর জীবনের যথাসর্বস্ব 'বিনোদ সাধুর' চরণে নিবেদন করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেবাকাজের প্রয়োজনেই সঙ্ঘের আশাশুনি সেবাশ্রমের জন্ম হয়।

ব্রহ্মচারী বিনোদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভূতপূর্ব সেবাকাজের সংবাদ সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণেই উত্তরবঙ্গের বন্যা, ওড়িশার বন্যা ও দুর্ভিক্ষ, মেদিনীপুরের বন্যা, পাবনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি দুর্যোগে আক্রান্ত নর-নারীর সেবার দায়িত্ব সঙ্ঘকেই নিতে হয়।

সঙ্ঘকাজের বিস্তারের জন্য ১৯২২ সালে বর্তমান সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় নির্মিত হয়েছে। এর আগে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মাঘী পূর্ণিমায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন নামে পরিচিত সঙ্ঘের একরূপতা আনার জন্য নামকরণ করেন— 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।'

নিজের নামে সঙ্ঘের নামকরণ না করে একটি সার্বজনীন নাম দেওয়ার মধ্যে তাঁর উদারতা, দেশপ্রেম ও ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তের পরিচয় মেলে। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হলো— ভারতের যুগ যুগ আচরিত অতি উদার ও সুমহান ধর্ম, সংস্কৃতি, আদর্শ ও ভাবধারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেজন্য সঙ্ঘের নামের সঙ্গে প্রথমেই জুড়ে থাকবে 'ভারত।' আর জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আর্ত পীড়িত, দুঃস্থ মানুষের সর্বপ্রকার নিঃস্বার্থ সেবাই হবে এই সঙ্ঘের প্রধান কাজ। সেজন্য 'সেবা' কথাটিও থাকবে। প্রাচীন ভারতের বৈদিক ভাব ও শিক্ষা সংস্কৃতির আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এই সঙ্ঘ। সেজন্য আশ্রম কথাটি থাকা প্রয়োজন। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিশাল জাতিকে এক সূত্রে গেঁথে নিয়ে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। সেজন্য এর নামের মধ্যে 'সঙ্ঘ' কথাটি ও রাখতে হবে। এইভাবে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হলো— 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।'

সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য হলো— ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে জাতিগঠন। এজন্য তিনি কতকগুলি কাজ নির্দিষ্ট করে দেন। এগুলি হলো— ১. ধর্মপ্রচার, ২. তীর্থসংস্কার, ৩. শিক্ষাবিস্তার, ৪.জনসেবা, ৫. হিন্দু মিলন মন্দির ও রক্ষীদল গঠন, ৬. বনবাসী ও অনুন্নত সমাজের উন্নয়ন, ৭. অস্পৃশ্যতা নিবারণ, ৮. শুদ্ধি আন্দোলন, ৯. ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার প্রভৃতি নানাবিধ সমাজ সংস্কারমূলক কাজ।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, মালদহ, সুন্দরবন, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি জেলায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের জনমুখী প্রকল্প গৌরবের দাবি রাখে। এছাড়াও রাঁচি, জামশেদপুর, গিরিডি প্রভৃতি এলাকায় বনবাসীদের মধ্যে সঙ্ঘের গ্রহণযোগ্যতা প্রশংসনীয়। শুধুমাত্র গয়াধামে তীর্থসংস্কার, পাণ্ডাদের উৎপীড়ন অত্যাচার থেকে সাধারণ তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করার জন্যই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দেশ জুড়ে নাস্তিকতা, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, জড়বাদ ও তমোগুণে অভিভূত বাঙ্গালি হিন্দুর আধ্যাত্মিক চেতনা জাগরণের জন্য তিনি গুরু-শিষ্য পরম্পরার সূচনা দ্বারা গার্হস্থ্য আন্দোলন শুরু করেন। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষদের ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা দান করে তিনি সমাজ সংসারে ঐক্যবোধের প্লাবন নিয়ে আসেন।

শিক্ষার প্রসারের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিচালিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যার্থীভবন রয়েছে। সেখানে বহু দরিদ্র শিক্ষার্থী বিনা ব্যয়ে থাকা-খাওয়ার সুযোগ লাভ করছে।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সাল থেকে দেশের কয়েক হাজার বিদ্যালয়ে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের উপর 'হিন্দু ধর্মশাস্ত্র' পরীক্ষা পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রতিটি হিন্দু মিলন মন্দির ও জেলাকেন্দ্রে দাতব্য চিকিৎসালয়, চক্ষু অপারেশন শিবির প্রভৃতি প্রশংসনীয় সেবাকাজ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নিত্য সাধনা। জোকায় ৬০০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল দেশের গৌরবের সম্পদ।

হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা রূপ মারণ-ব্যাধি দূর করার জন্য ও সকল হিন্দুর মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলার জন্যই গুরুমহারাজ 'হিন্দু মিলন মন্দির' গঠন করেন। বর্বর বৈরী শক্তির আক্রমণ থেকে সমাজ ও স্বদেশকে রক্ষা করার জন্য 'হিন্দু রক্ষীদল' গঠন করেন। তরুণ সমাজে ব্যয়াম, লাঠিখেলা, ছোরা, কুস্তি প্রভৃতির অনুশীলন তারই অঙ্গ। স্বামী প্রণবানন্দজী বলেছেন— 'লোকে জপ করে কাঠের মালায়, তুলসীর মালায়, আমি আজীবন জাতিগঠনের মন্ত্রজপ করে চলেছি। হিন্দুর দুর্দশা দেখে তিনি আকুল হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দু জনগণের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিশেষ আশীর্বাদ ও শক্তি সঞ্চার করেন। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ভগবান আচার্যদেবের অলৌকিক আশীর্বাদ ও শক্তি সঞ্চারের জন্যই আজ আমরা বাঙ্গালি হিন্দু পরিচয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারছি। আজ ১২৫ বছর পরে তাঁর কর্মধারা কতটা প্রাসঙ্গিক বর্তমান প্রজন্ম তাঁর মূল্যায়ন করবেন।

বহু দধীচি হাড় দিল ভাই
দানব দৈত্য তবু মরে নাই।

ভারতবর্ষ থেকে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আবারও পশ্চিম বাংলাদেশ গঠনের জন্য বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী মডিউল নতুনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ভয়ংকর এই পরিস্থিতিতে মানবতা আজ বিপন্ন। সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বিশ্ব মানবতার বীজ লুকিয়ে আছে তাকে যদি রক্ষা করতে হয়, তবে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের দেখানো পথই আদর্শ মানব মুক্তির পথ।

তাঁর অমৃতময় বাণী— ''হিন্দু! তুমি কি জান না— তুমি শক্তির পূজক, মহাশক্তির উপাসক? তোমার সেই শক্তির সাধনা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন, তাহা দেখিয়া তুমি কী চিন্তা করিবে? শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন, তারা দেখিয়া তুমি কী ভাবনা ভাবিবে? কালীর হাতে রক্তাক্ত খড়্গ, দুর্গার হাতে দশপ্রহরণ, তাহা দেখিয়া তুমি কী শিক্ষা লাভ করিবে? এই মহাশক্তির সাধনা করিয়া মানুষ দুর্বল হইতে পারে কি? একবার ধীর স্থির হইয়া চিন্তা কর।''

(মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

দেশভাগের পর ছিন্নমূল বাঙ্গালী।

জাতি রক্ষার্থে মাটি ভাগ হয়েছে, এবার ভাষা ভাগ হোক

সুমিত রায়

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। ২ নভেম্বর ২০২০, কোভিড মহামারীতে দ্বিতীয় দফার লকডাউন শুরু হবে মধ্যরাত থেকে। ঠিক তার চার ঘণ্টা আগে প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ভিয়েনা। এই সন্ত্রাসবাদী কাণ্ডে পুলিশ যে ১৫ জন সম্ভাব্য জেহাদিকে গ্রেপ্তার করল তার মধ্যে দু'জন বাংলাভাষী। তারও কয়েক বছর আগে ২০১৭ সালে টাইমস স্কোয়ার, নিউ ইয়র্ক। আত্মঘাতী মানববোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করে বাংলাভাষী জেহাদি আকায়েদুল্লা। ২০১০-এ লন্ডনে সাংসদ স্টিফেন টিমসকে ছুরি দিয়ে জিহাদি আক্রমণ করে বাংলাভাষী রোশনারা চৌধুরী।

এরা সকলেই বাংলায় কথা বলে। আর গত কয়েক দশক ধরে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা পাখিপড়ার মতো গিলিয়ে এসেছে, বাংলায় কথা বললেই বাঙ্গালি। নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানে জাতিসত্তার স্বীকৃত সংজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, ধর্ম ও সংস্কৃতি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে জাতিসত্তার এই উত্তর-আধুনিক সংজ্ঞাই চলছে আজকাল। তাই ভিয়েনার সন্দেহভাজন বাংলাভাষী সন্ত্রাসবাদী আকায়েদুল্লা ও রোশনারা চৌধুরী সকলেই বাঙ্গালি। বিশ্ব এখন বাঙ্গালিকে এভাবেই চিনতে শিখছে। দাড়ি ও হিজাব তার পরিচয়। বাঙ্গালির জাতিসত্তা দখল হয়ে গেছে, এবারে বাংলাভাষার পালা।

বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি সনাতনী বাঙ্গালির আত্মপরিচয় বেদখলের শুরু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, ছদ্ম বাঙ্গালির দেশ বাংলাদেশের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। যে শব্দবন্ধ দেশভাগের আগে অখণ্ড বঙ্গকে বোঝাত এবং দেশভাগের পর সনাতনী বাঙ্গালির হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গকে বোঝাত। ১৯৭১-এ তা হঠাৎ করেই স্বাধীনতাকামী পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নাম হয়ে গেল বাংলাদেশে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জাতীয়তাও হয়ে গেল বাঙ্গালি। বাংলাদেশের সৃষ্টি মানেই দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত। সুতরাং স্বাধীন বাংলাদেশে সনাতনী বাঙ্গালির সমানাধিকার নিশ্চিত, এই মিথ্যা স্তোকবাক্যে পশ্চিমবঙ্গকে ভুলিয়ে তার আত্মপরিচয়কে গ্রাস করল বাংলাদেশ।

৯ আগস্ট ১৯৮৮। বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম। প্রমাণ হলো দ্বিজাতিতত্ত্ব দ্বিজাতিতত্ত্বের জায়গাতেই আছে। কিন্তু ততদিনে পশ্চিমবঙ্গের সনাতন বাঙ্গালির অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। কারণ ঠিক তার পরের বছরই সনাতন বাঙ্গালির চিরায়ত পঞ্জিকাকে ক্ষতবিক্ষত করে বাংলাদেশ তার জন্য একটি নতুন বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রণয়ন করে। এই নতুন ক্যালেন্ডারের নববর্ষ পালনের জন্যও নতুন কিছু ভুঁইফোঁড় প্রথাও রাতারাতি বানিয়ে ফেলা হয়। তারই অংশ হিসেবে আলপনার পবিত্রতাকে পদদলিত করতে প্রচলন হয় রাস্তা জুড়ে আলপনা আঁকার। তারপর দিনভর সেই আলপনার উপর দিয়ে চলবে গাড়ি, ঘোড়া, মানুষ, কুকুর। অথচ আলপনা একটি সনাতন বাঙ্গালি ঐতিহ্য। আলপনার অবস্থান ঠাকুর ও ঠাকুরমশাইয়ের ঠিক মাঝখানে। আলপনা শুধু চিত্রকলা নয়, এটি একটি পবিত্র চিত্রকলা। উত্তর ভারতে একই ধরনের চিত্রকলা 'রঙ্গোলি' ও দক্ষিণ ভারতে কোথাও 'পুকালাম' এবং কোথাও 'মণ্ডলা' নামে পরিচিত। ওইসব অঞ্চলে কেউ

ফ ঃ ৫

কল্পনাও করতে পারেন না, রঙ্গোলি বা পুকালামের উপর পা রাখার কথা। অথচ বাঙ্গালির আদি সংস্কৃতি বাংলাদেশের দখলে যাবার পর এমনই হতশ্রী অবস্থা হয়েছে আলপনার। ছাড় পায়নি বাঙ্গালি খাবারের ঐতিহ্যও। নতুন বছরে নতুন চালের পায়েস খাওয়াই বাঙ্গালির রীতি। অথচ মেকি নববর্ষের প্রণেতা বাংলাদেশ শুধুমাত্র রীতি পালটানোর জন্য বাসি পান্তা আর পুরোনো ভর্তা খাবার নিয়ম চালু করল। শ্রীশ্রী লক্ষ্মী-গণেশ নিয়ে সূর্যোদয়ের আগে ঘটযাত্রার পরিবর্তে শুরু হলো ঠা ঠা রোদ্দুরে মঙ্গল শোভাযাত্রা। মঙ্গলঘট ছাড়া মঙ্গল শোভাযাত্রার হাস্যকর ভড়ং। এসবের মাধ্যমে সনাতনী বাঙ্গালির পয়লা বৈশাখকে বিকৃত করে এক নতুন পয়লা বৈশাখের প্রচলন করেছে ছদ্ম বাঙ্গালিরা।

বাঙ্গালির ইতিহাস দখলের শোকগাথা এখানেই শেষ নয়। ফিরে আসি বর্তমানে। আজকের যুগে জাতীয় ঐতিহ্য একটা বিরাট লাভজনক পণ্য। প্রাচীন স্থাপত্য যেমন মন্দির, নাটমন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদি যেমন পর্যটন ব্যবসাকে উৎসাহিত করে; তেমনি প্রাচীন শিল্পকলা যেগুলো আজও টিকে রয়েছে যেমন তাঁতের কাজ, পটচিত্র ইত্যাদি সেই জাতিকে বিদেশি মুদ্রা লাভ করতে এবং সচ্ছল জীবন যাপনে সাহায্য করে। প্রাচীন শিল্পকলার ঐতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করে 'ভৌগোলিক সূচক' বা 'জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন'! একেই ছোটো করে বলা হয় জিআই। এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি রয়েছে। কোন অঞ্চলের কোন পণ্য বিখ্যাত, জিআই স্বীকৃতি সেটিকেই সুনিশ্চিত করে। এই সূত্র মেনেই মসলিনের জি আই দরখাস্ত জমা দিয়েছে বাংলাদেশ। কারণ 'ঢাকাই মসলিন' নামে এই কাপড় বহু যুগ ধরেই বিশ্ববিখ্যাত। মসলিন কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'মসৃণ' থেকে। মসলিন কথাটি যে সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, এর থেকেই বোঝা যায় যে এটি সনাতন বাঙ্গালি তাঁতিদের সৃষ্টি। কথিত আছে যে এই কাপড় এতই সূক্ষ্ম ছিল যে আঠারো হাত কাপড় একটা আংটির মধ্য দিয়ে গলে যেত। সনাতন বাঙ্গালির মেধা ও শ্রমের মেলবন্ধনে সৃষ্ট যে অপূর্ব শিল্পকর্মকে এককালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ধ্বংস করে দিয়েছিল, দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা সনাতনী বাঙ্গালির মেধা ও শ্রম তা পুনরায় সৃষ্টি করেছে পশ্চিমবঙ্গের কালনায়। অথচ 'ঢাকাই মসলিন' কথাটার জোরেই হয়তো এই জি আই পেয়ে যাবে বাংলাদেশ। সনাতন বাঙ্গালিকে ওরা চায় না, কিন্তু সনাতন বাঙ্গালির সৃষ্টি করা শিল্পকলার মালিকানা ওরা দখল করতে চায়। ঠিক একইভাবে ২০১৭-এ জামদানির জিআই পেয়েছে বাংলাদেশ। অথচ জামদানির আদি প্রস্তুতকারী সনাতনী বাঙ্গালি বস্ত্রবয়নশিল্পীরা দেশভাগের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ফুলিয়ায় নির্বাসিত। একইভাবে ইসলামি দেশ বাংলাদেশ দখল করেছে সনাতন বাঙ্গালি ময়রাদের সৃষ্টি অপূর্ব সব মিষ্টি। বগুড়ার লাল দই, পোড়াবাড়ি চমচম, মহিষের দুধের দই এই সবই এখন জিআই প্রাপ্তির সৌজন্যে বাংলাদেশের দখলে। আগামীদিনে আরও কত কী বেহাত হবে, কে জানে।

বাংলাভাষীদের মধ্যে হিন্দু বাঙ্গালি ১৫ শতাংশ। বিগত দেড় শতাব্দীর যা ট্রেন্ড তাতে জোর দিয়ে বলাই যায় যে আগামী দিনে এই সংখ্যা আরও কমবে। শুধুমাত্র জনসংখ্যার জোরে এবং রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় ছদ্ম বাঙ্গালিরা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করবে সনাতনী বাঙ্গালির আত্মপরিচয়কে। একে একে বিকৃত করে দখল করবে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এবং আত্মসাৎ করবে তার মেধাস্বত্বজাত পণ্যকে। শুধু জাতে নয়, ভাতেও মরবে সনাতনী বাঙ্গালি। এই একই কাণ্ড কিন্তু হচ্ছিল গ্রিসের আদি মেসিডোনীয়দের সঙ্গে। যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে সৃষ্টি হওয়া মেসিডোনিয়ার স্লাভ বংশোদ্ভূত নব্য মেসিডোনীয়রা একে একে দখল করছিল তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। তারপর একদিন আলেকজান্ডার হয়ে গেল স্লাভ। এতেই টনক নড়ে আদি মেসিডোনীয়দের। গ্রিসের কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় মেসিডোনিয়া অঞ্চলের আদি মেসিডোনীয়রা আন্তর্জাতিক স্তরে দরবার করে এই জাতিসত্তা চুরির বিরুদ্ধে। অবশেষে যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে সৃষ্ট মেসিডোনিয়ার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'উত্তর মেসিডোনিয়া'। নিজেদের আত্মপরিচয় ফিরে পায় গ্রিসের আদি মেসিডোনীয়রা।

১৯৪৭-এ পৃথক ধর্ম-সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গঠিত দ্বিজাতিতত্ত্বের কারণেই দেশভাগ হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গলার বেলায় বলা হলো, বাঙ্গালি অখণ্ড জাতি। যৌথ ভাষা-সংস্কৃতি, শুধু ধর্মটাই যা আলাদা। কোনো অসুবিধা হবে না, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পুরোটাই পাকিস্তানে যেতে পারে। নিদেনপক্ষে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বঙ্গ হোক। নোয়াখালি গণহত্যার তাজা ক্ষত বুকে নিয়ে সেদিন মাটি ভাগ করার বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন হিন্দু বাঙ্গালি নেতৃত্ব। তার যথার্থতা প্রমাণ হয় পূর্ব পাকিস্তানে সনাতনী বাঙ্গালির উপর্যপুরি গণহত্যায়, লক্ষ লক্ষ সনাতনী বাঙ্গালি আশ্রয় নেয় পশ্চিমবঙ্গে।

সেদিনের মতো আজও কিন্তু আর এক অস্তিত্ব সংকট। আত্মপরিচয়ের সংকট। নোয়াখালির মতো সাম্প্রতিক কোনো বড়ো ক্ষত না থাকলেও ১৯২৬-এর পাবনা বা ১৯৪১-এর ঢাকার মতো ২০১৭-র একটা জামদানি বা মসলিনের ক্ষত আছে। এই সংকট থেকে বের হতে গেলে হিন্দু বাঙ্গালিকে তার আত্মপরিচয়ের পুনর্দখল নিতে হবে। তবেই ফেরত পাওয়া সম্ভব নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মেধাস্বত্বজাত পণ্যের মালিকানা আদি মেসিডোনীয়দের মতো। যদিও মেসিডোনীয়দের সঙ্গে বাঙ্গালির পার্থক্য এই যে ওদের ক্ষেত্রে ভাষা ছিল পৃথক। তাই ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার সংজ্ঞা এনে আদি মেসিডোনীয় আর নব্য মেসিডোনীয়দের একই জাতি বলার সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখানে সেটা রয়েছে। বাংলায় কথা বললেই বাঙ্গালি— এটাই হিন্দু বাঙ্গালির আত্মপরিচয় সংকট থেকে উত্তরণের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

উভয়ে বাংলায় কথা বললেও, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, হিন্দু বাঙ্গালির বাংলাভাষা আর ছদ্ম বাঙ্গালির বাংলাভাষার মূলগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য কোনো অঞ্চলভিত্তিক উপভাষাগত পার্থক্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা মানে ঘটি ভাষা আর বাংলাদেশি বাংলা মানে বাঙ্গাল ভাষা নয়। ঘটিরাও সনাতন বাঙ্গালি আর বাঙ্গালরাও তাই। ঘটি-বাঙ্গাল দুজনের বাংলাভাষাই আদি সনাতন বাংলা। কিন্তু সনাতন বাংলা ও আরবি বাংলা এক নয়। এই দুই ভাষার পার্থক্য তার চরিত্রে যা গঠিত হয়েছে মধ্যযুগ থেকে এবং পরিশীলিত হয়েছে দেশভাগের পর। বাংলাদেশ গঠনের আগে থেকে, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান আমলেই 'আরবি বাংলা'-কে সুগঠিত করা হয় প্রায় ৩০ শতাংশ আরবি, ফার্সি শব্দ যোগ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এই 'আরবি বাংলা'-ই হয়ে ওঠে বাংলাদেশি বাংলা। ভাষা বিবর্তনে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। সার্ব আর ক্রোয়েট ভাষা যেমন। দুটোরই শব্দ, ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রায় এক হলেও নির্দিষ্ট কিছু মূলগত পার্থক্যের জন্য ভাষা দুটি পৃথক ভাষা হিসেবেই স্বীকৃত।

সনাতনী বাংলা ও বাংলাদেশি বাংলার পার্থক্যের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় ভাষার বয়সের কথা। সনাতনী বাংলা অন্তত দেড় থেকে দু' হাজার বছরের পুরনো। এই ভাষা আক্ষরিক অর্থেই একটি ধ্রুপদী ভাষা। সেখানে এই

বাংলাদেশি বাংলার বয়স মেরেকেটে ৬০০ বছরও হবে না।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যের ধারা। ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব সাহিত্যে অনিবার্য। তাই স্বাভাবিক কারণেই সনাতনী বাংলা সাহিত্যে সনাতন ধর্মের থিমই প্রধান। পৌরাণিক চরিত্রের আধিক্য সেখানে, মঙ্গলকাব্যগুলোই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অপরদিকে বাংলাদেশি বাংলা যা মধ্যযুগে দোআঁশলা বাংলা ও পরবর্তীতে 'মুসলমানি বাংলা' বলে পরিচিত হয়েছিল তাতে বাংলার মানুষের কথা খুব বেশি নেই। 'মুসলমানি বাংলা' সাহিত্যে মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষত আরব দেশ ও পারস্যের ধর্মীয় ও রূপকথার চরিত্রের আধিক্য এবং কেচ্ছা সাহিত্যই ছিল প্রধান।

পেঁচার মুখ নিয়ে বাংলাদেশে ১লা বৈশাখ উদ্‌যাপন।

তৃতীয় পার্থক্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দমালায়। সনাতনী বাংলায় তৎসম শব্দ ও দেশীয় শব্দের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। আরবি, ফার্সি, তুর্কি, উর্দু শব্দের প্রাবল্য কম। বাংলাদেশি বাংলায় তৎসম ও দেশি শব্দের প্রচলন অপেক্ষাকৃত কম। আরবি, ফার্সি, তুর্কি, উর্দু শব্দের আধিক্য চোখে পড়ার মতো।

চতুর্থ পার্থক্য লিপিতে। সনাতনী বাংলা যেখানে ঐতিহাসিকভাবে শুধুমাত্র পূর্ব নাগরী লিপিতেই লেখা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশি বাংলা মূলত পূর্ব নাগরীতে লেখা হলেও, পূর্বে কখনও কখনও অন্যান্য লিপিতেও লেখা হয়েছে। মধ্যযুগে চট্টগ্রামে আরবি লিপিতে ও শ্রীহট্টের নবাবের সহায়তায় সিলেটি নাগরী লিপিতে এই বাংলা লেখার প্রচলন ছিল। বর্মার রোহিঙ্গারা চট্টগ্রামের বাংলায় কথা বললেও, সেই বাংলা লেখে আরবি লিপিতে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানেও বছর দুয়েক আরবি লিপিতে লেখা হয়েছিল সরকারি প্রচেষ্টায়। মোহম্মদ শহিদুল্লাহ-সহ বহু বাংলাভাষী বিশিষ্টজনের এক কমিটি ২০ বছরের মধ্যে পাকাপাকিভাবে আরবি লিপিতে চলে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

পঞ্চমত রয়েছে বর্ণমালার একক বর্ণের পার্থক্য। ঐতিহ্যগতভাবে সনাতনী বাংলায় দুটি 'ব' রয়েছে— বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'। বাংলাদেশি বাংলায় একটাই 'ব' এবং তা হলো বর্গীয় 'ব'। সনাতনী বাংলায় কোনো কোনো ধর্মীয় সাহিত্যে বর্গীয় 'ব'-কে 'ব' চিহ্ন ব্যবহার করে লেখার রীতি আছে, যা বাংলাদেশি বাংলায় একেবারেই অনুপস্থিত। এছাড়াও সনাতনী বাংলায় আঞ্জি বা সিদ্ধিরস্তু (◻) ও ঈশ্বর (৺) t বলে দুটি বর্ণের ব্যবহার আছে, যা বাংলাদেশি বাংলায় ব্যবহৃত হয় না।

ষষ্ঠ পার্থক্য টাইপোগ্রাফি সংক্রান্ত, মূলত যুক্তাক্ষরের, তবে অক্ষরের জন্য হতে পারে। সনাতনী বাংলায় এমন অনেক যুক্তবর্ণ আছে যার জন্য বিশেষ টাইপোগ্রাফিক লিটিগেচার ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ 'ক্র', যা বাংলাদেশি বাংলায় 'ক' চিহ্নের নীচে 'র'-ফলার ডায়াক্রিটিক চিহ্ন ব্যবহার করে লেখা হয়। আবার সনাতনী বাংলায় হ্রস্ব উ-কারের একটি বিশেষ ডায়াক্রিটিক চিহ্ন যা 'শু', 'গু' ইত্যাদিতে ব্যবহার হয় তা বাংলাদেশি বাংলায় 'শ' বা 'গ'-এর নীচে হ্রস্ব উ-কারের সাধারণ চিহ্ন (ু) ব্যবহার করেই লেখা হয়।

সপ্তম পার্থক্য বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে। 'z'-এর উচ্চারণযুক্ত বিদেশি শব্দ সনাতনী বাংলায় 'জ' ব্যবহার করে লেখা হয়। উদাহরণ নামাজ। একই শব্দ বাংলাদেশি বাংলায় লেখা হয় নামায। মূল উচ্চারণও অক্ষুণ্ণ রাখা হয়।

অষ্টম পার্থক্য এই যে বর্তমানে দুটি ভাষার নিয়ামক সংস্থা পৃথক। সনাতনী বাংলার নিয়ামক সংস্থা পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে তা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি। বাংলাদেশি বাংলার নিয়ামক সংস্থা বাংলা অ্যাকাডেমি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সনাতনী বাঙ্গালি আর ছদ্ম বাঙ্গালির ধর্ম-সংস্কৃতির পাশাপাশি ভাষাও পৃথক অথচ তার কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। ভাষা নিয়ামক সংস্থা 'এস আই এল' ভাষা স্ট্যান্ডার্ড ISO 639-3-এর ব্যাখ্যায়, একক ভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন : দুটি ভাষা ভাব আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় পারস্পরিক ভাবে অনুধাবনযোগ্য হলেও, সুপ্রতিষ্ঠিত পৃথক জাতিগত সত্তার অস্তিত্ব থাকলে এবং বিশেষ করে যদি ওই দুই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক সীমারেখা থাকলে দুটিকে পৃথক ভাষা হিসেবে গণ্য করতে হবে। 'ভাষা নিয়ামক সংস্থা' হলো এমন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যারা পৃথক ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে এবং কোনো কোনো নিয়ম মানলে তবে একটি ভাষাকে আরেকটির থেকে পৃথক বলা যায়, সেসবেরও নীতি নির্দিষ্ট করে।

ধর্ম-সংস্কৃতির ভিত্তিতে হিন্দু বাঙ্গালি ও ছদ্ম বাঙ্গালির পৃথক জাতিগত সত্তা দেশভাগের সময়ই স্বীকৃত। কারণ সত্যিই যদি উভয়ে এক জাতি হতো, তাহলে বঙ্গ ভাগের দরকার পড়ত না। তাছাড়াও দেশভাগের পরে এই দুটো জাতিসত্তা পৃথক পৃথকভাবে বিকশিত হয়েছে। যার প্রভাব ব্যবহার্য ভাষাতেও পড়ে। এই যুক্তিতেই মূক-বধিরদের জন্য ব্যবহৃত সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে ২০১৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ও বাংলাদেশের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ পৃথক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই স্বীকৃতি দিয়েছে উপরোক্ত ভাষা নিয়ামক সংস্থা। উপযুক্ত ভাবে আবেদন করলে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মতো একইভাবে স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রেও এই পৃথক স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব।

আত্মপরিচয়ের এই সংকট থেকে মুক্ত হতে গেলে হিন্দু বাঙ্গালি নেতৃত্বকে সমস্ত আবেগ সরিয়ে রেখে নিতে হবে ভাষা ভাগ করার বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত। ১৯৪৭-এও অস্তিত্ব সংকট থেকে মুক্ত হতে হিন্দু বাঙ্গালি নেতৃত্ব সমস্ত আবেগকে সরিয়ে রেখে মাটি ভাগ করার কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, প্রেমহরি বর্মণের সেই দূরদর্শী সিদ্ধান্তেরই সুফল বিশে জুন পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি। সেই পথই অনুসরণ করতে হবে আজ।

নিজেদের এক টুকরো মাটি পেয়েছি প্রায় সাড়ে সাত দশক আগে, এবারে ভাষার দখল চাই। বাংলাদেশি ভাষা বাংলাদেশেরই থাক, সনাতনী বাংলা পশ্চিমবঙ্গ পাক। ◻

বাংলা ভাষার আরবিকরণের পাঁচটি ধাপ

স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী

বাংলা ভাষার শিকড়ে প্রাকৃত, হৃদয়ে সংস্কৃত। সেজন্যই এই ভাষায় আরবিকরণের চেষ্টা খুব একটা সহজ হয়নি। তবে বাংলার খোলনলচে পর্যন্ত পালটে ফেলার চেষ্টা চলেছে অবিরাম। ধাপে ধাপে ধ্বংস করে দেবার জন্য বারবার আক্রমণ চালানো হয়েছে। বাঙ্গালি যখন অবিভক্ত বঙ্গে সংখ্যাগুরু ছিল, প্রবল বিক্রমে সে নিজের ভাষা রক্ষা করেছে। হিন্দু বাঙ্গালি সংখ্যায় যত কমেছে, ততই বাংলার উপর জেঁকে বসেছে এক ভীষণ সঙ্কট। আরবি, ফার্সি, তুর্কি শব্দের ভারে চাপা পড়ে বাংলাভাষা ক্রমেই নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে। তার নিজস্ব চরিত্র ম্লান হচ্ছে। কারণ প্রতিটি ভাষার কিছু নিজস্বতা থাকে। শব্দ, বাক্যের গঠন, ব্যাকরণ, উচ্চারণ, সামাজিক রীতিনীতি এইসব দিয়েই প্রত্যেক ভাষা কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। আরব সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হলো এর প্রতিটিকে মুছে দিয়ে ভাষাটাকে কেবলমাত্র একটা আরবের অনুসারী ভাষায় পরিণত করা। মনে রাখতে হবে, ভাষা টিকে থাকে চর্চায়। চর্চা না করলে যেমন ভাষা হারিয়ে যায়, ঠিক তেমনই যে জনগোষ্ঠী যত বেশি কোনো ভাষার চর্চা করে; সেই ভাষার উপর ওই জনগোষ্ঠী তত বেশি প্রভাব ফেলে। বাংলায় যারা কথা বলেন, তাদের মধ্যে এখন মাত্র ১৫ শতাংশ বাঙ্গালি এবং ৮৫ শতাংশ হলো বাংলাভাষী। অতএব, বাংলাভাষাতে কার প্রভাব বেশি হবে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। আর এই ৮৫ শতাংশের প্রভাবশালী অংশের জন্যই বাংলাভাষাতে বর্তমানে আরবিকরণ চলছে।

বাংলা ভাষায় এই আরবিকরণের সূচনা মূলত বহিরাগত সুফি হানাদারদের হাত ধরে। সুফিদেরকে অনেকে নিঃস্বার্থ ধর্মগুরু মনে করলেও এরা ছিলেন একাধারে যোদ্ধা ও ধর্মান্তরের কারিগর। এঁদের লক্ষ্য ছিল ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দু বাঙ্গালিকে ধর্মান্তরিত করা। সুফিরা বাংলাভাষাকে খুব একটা সুনজরে দেখত, এমন প্রমাণ নেই। তাই বাংলা শেখার কোনো ইচ্ছা বা ধৈর্য তাদের ছিল না। তারা কথা বলত আরবি-ফার্সির মিশেল দেওয়া এক বিকৃত বাংলায়। সাতশো-আটশো বছর আগে যখন অবিভক্ত বঙ্গে সুফিদের আগমন শুরু হয়, বাঙ্গালি বলতে কেবল হিন্দু বাঙ্গালিই বোঝাত। তখনো বঙ্গে কোথাও নবাব বা সুলতানি শাসন শুরু হয়নি। ফলে সুফিদের আরবী মিশ্রিত কথা বাঙ্গালিদের পক্ষে বোঝা অত্যন্ত

আরবিকরণকে রুখতে গেলে প্রথমেই দরকার বাংলার শুদ্ধিকরণ। অর্থাৎ যোগ্য বাংলা শব্দ খুঁজে, আরবি-ফার্সি যাবতীয় বিদেশি শব্দকে বাংলা ভাষা থেকে বহিষ্কার করা। এই প্রক্রিয়াতেই সনাতন বাংলা তার নিজস্ব চরিত্র আবার ফিরে পাবে।

দুষ্কর ছিল। এমনকী ওই বিকৃত মিশ্র বাংলা সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল কৌতুকের বিষয়। ফলে সুফিদের ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি-তুর্কি শব্দগুলো ঠাট্টার ছলে বাঙ্গালিরা ব্যবহার করা শুরু করে সম্পূর্ণ উলটো অর্থে।

যেমন—তুর্কি ভাষায় 'উলুগ' মানে হলো 'মহান'! এই উলুগ থেকে বাংলায় উল্লুক কথাটা এসেছে। বাংলায় উল্লুক মানে বোকা। আবার, উজবেক সেনাদের বীরত্ব গাথা সুফি পির-দরবেশদের মুখে মুখে ফিরত। কিন্তু বঙ্গবীর ইছাই ঘোষ একবার তুর্কি বাহিনী এবং তাদের উজবেক ভাড়াটে সৈন্যদলকে রাঢ়ি জঙ্গলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারার পর বাংলায় দুটো নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়। একটি হলো 'তুর্কি নাচন', আরেকটি 'উজবুক'! উজবেক সেনাবাহিনীর কথিত বীরত্বের প্রতি বাঙ্গালির তাচ্ছিল্যের প্রতীক হলো 'উজবুক'! উজবুক মানে নির্বোধ। একইভাবে 'বুজুর্গ' বা জ্ঞানী বৃদ্ধ বাঙ্গালির কাছে হয়ে উঠল 'বুজরুক' বা ভণ্ড। সুফিদের কাছে যেটা 'নেকি' বা পুণ্য, সেটাই বাঙ্গালিদের কাছে হয়ে দাঁড়াল 'ন্যাকামি'! আরবি জ্ঞানের ডিগ্রি 'ফাজিল' বাংলা ভাষায় হয়ে গেল ফাজলামি। দুটো কথার অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। এভাবে ভাষা দিয়েই ভাষা আগ্রসনের যোগ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বাঙ্গালীরা।

এরপরে বঙ্গের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে যখন নবাবি বা সুলতানি শাসন শুরু হল, ধীরে ধীরে আরবি অনুপ্রবেশ বিস্তার পেতে লাগল। কারণ বঙ্গে সাম্রাজ্য স্থাপন করলেও সুলতান ও নবাবদের দরবারের ভাষা বাংলা ছিল না। ফার্সি ভাষাতেই চলত বঙ্গে শাসনের কাজ। বিচারের জন্য আইন, আদালত ইত্যাদিও হত বিদেশি ভাষাতেই। ভাষা সমস্যার জন্য ন্যায়বিচার পাওয়া কার্যত ছিল অসম্ভব। যে কারণে একপেশে অযৌক্তিক বিচার-ব্যবস্থাকে এখনো বাংলাতে 'কাজির বিচার' বলা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভূমি-রাজস্ব, কর আদায় ইত্যাদি সমস্ত কিছুই যেহেতু আরবি-ফার্সিতে

সম্পন্ন হতো, তাই সাধারণ বাঙ্গালিকেও এসব ভাষায় কিছুটা সড়গড় হতে হয়েছিল। তারই প্রভাব বাংলা ভাষাতেও পড়ে। আইন, আদালত, জমি, দাখিল, জারি, দরখাস্ত, বরখাস্ত ইত্যাদি অসংখ্য বিদেশি শব্দ ঢুকে পড়তে থাকে সুলতানি বদান্যতায়। যেখানে বাঙ্গালি এসব বহিরাগতদের কাছে রাজত্ব হারিয়েছে, সেখানেই যোগ্য বাংলা শব্দকে ঠেলে সরিয়ে, জুড়ে বসেছে আরবি কিংবা ফার্সি শব্দ।

বঙ্গে নবাবি শাসন যখন শেষের মুখে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে ইংরেজ শাসন শুরু হতে চলেছে; তখনই গরিবুল্লা, সৈয়দ হামজা ইত্যাদির প্রেরণায় এক অদ্ভুত বাংলার আবির্ভাব ঘটে। ৩৫%-৪০% আরবি-ফার্সি শব্দ মিশ্রিত বাংলা। রেভারেন্ড জেমস লং, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ একে ‘মুসলমানি বাংলা’ নামে অভিহিত করেছেন। সমগ্র ইংরেজ শাসনকাল জুড়ে ছিল এর ব্যাপ্তি। এই ‘মুসলমানি বাংলা’-তে যেসব গল্প-কবিতা রচনা করা হত, সেসবেরও কোন স্থানীয় ভিত্তি ছিল না। প্রতিটি গল্প কবিতার বিষয়বস্তু ছিল মধ্যপ্রাচ্যের কোন বীর যোদ্ধা বা প্রেমিক-প্রেমিকা। গরিবুল্লার আমির-হামজা কাব্য বা ইউসুফ-জুলেখা এর যোগ্য নিদর্শন। ইংরেজ রাজত্বেই আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়, যার প্রবর্তক ছিলেন তিতুমির। বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী ছিল। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগতদের বংশধররা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বা আশরাফ। এদের নাম কখনোই বাংলাতে হতো না। কিন্তু স্থানীয় ধর্মান্তরিত বা আতরাফ মুসলমানদের নাম বাংলাতেই রাখা হত। তিতুমিরের প্রভাবে বাংলার আতরাফদের নামও আরবিতে রাখা শুরু হয়। তিতুমির ছিলেন ওয়াহাবি বা শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের পুরোধা। ফলে বাংলার থেকে তার কাছে আরবি ভাষা অবশ্যই বেশি পবিত্র ছিল। আর ‘মুসলমানি বাংলা’ ছিল, বাংলা এবং আরবির মধ্যবর্তী একটা পর্যায়। ধীরে ধীরে বাংলার থেকে আরবির দিকে যাবার একটা ধাপ। কিন্তু পরবর্তীতে এই ‘মুসলমানি বাংলা’র খানিকটা দেশীয়করণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। এদের লেখাতে আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার আগের মতো বা আরও বেশি হলেও, লেখার বিষয়বস্তু মধ্যপ্রাচ্যের বদলে বঙ্গ ও ভারত সংক্রান্ত হয়। স্থানীয় ও জাতীয় স্তরের নানান সমস্যা নিয়ে এঁরা সাহিত্য রচনা করে গেছেন।

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি আমল শুরু হলে বাংলার আরবিকরণ প্রবেশ করে তার চতুর্থ থাপে। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হলেও, বাংলাকেও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে জোরালো দাবি জানান ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম দিকে মুহম্মদ শহিদুল্লাহর মত বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীরা একে বিশেষ পাত্তা দেননি। শহিদুল্লাহ মনে করতেন উর্দু বনাম বাংলা ঝগড়া লাগিয়ে লাভ নেই। কারণ, প্রতিটি মুসলমানের ভাষা আরবিই হওয়া উচিত। কিন্তু আরবি শিক্ষা যেহেতু উর্দুভাষী ও বাংলাভাষী, সকলের পক্ষেই খুব অসুবিধাজনক, তাই একটি নতুন সমাধান সূত্র খোঁজা শুরু হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ সালে বাংলাকে সরকারি ভাষা করার দাবি মেনে নেয় ঠিকই। তবে সেই বাংলা সনাতন আদি বাংলা নয়। সরকারি মদতে ৩০%-৩৫% আরবি-ফার্সি শব্দ ঢুকিয়ে এক নতুন বিকৃত বাংলা তৈরি করে তাকেই মান্যতা দেওয়া হয়। খুঁজে খুঁজে বাদ দেওয়া হতে থাকে বা বিকল্প শব্দ তৈরির চেষ্টা হতে থাকে সনাতনের ছাপ থাকা যে কোন বাংলা শব্দের। ছাড় পায়নি ফুল, ফল, লতা, গাছ বা পাখির নামও। যেমন---রামধনু, লক্ষ্মী মেয়ে, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, মোহনভোগ, গোবিন্দভোগ ইত্যাদি। বানিয়ে ফেলা হয় এসব বিকল্প শব্দ এবং আরবি-ফার্সি শব্দ সংবলিত নতুন বাংলা অভিধান। শুধু তাইই নয়, বাংলা লিপির বদলে আরবি লিপিতে এই নতুন বাংলা লেখা যায় কিনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল তা নিয়েও।

পাকিস্তান আমল শেষ হয়ে ১৯৭১ থেকে শুরু হয় বাংলাদেশ আমল। বাংলাদেশ আমলে আরবি-মিশ্রিত বাংলা তৈরির কাজে এক নতুন গতি আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে বাংলাদেশকেই বাংলা ভাষার একমাত্র ধারক-বাহক এবং বাংলাদেশের বাংলাকেই প্রকৃত বাংলা বলে প্রচার করা শুরু হয়। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটে বাংলা বলে যেটা লেখা হয় সেটা আসলে ‘মুসলমানি বাংলা’-র বর্তমান উত্তরাধিকারী বাংলাদেশের বাংলা। বাংলাদেশের এই ভাষা সাম্রাজ্যবাদের ঢেউ এসে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার বাংলাতেও। এখানেও ধীরে ধীরে রামধনু হয়ে যাচ্ছে রংধনু, ‘লক্ষ্মী মেয়ে’-র বদলে ভাল মেয়ের কদর বাড়ছে, বিদ্রোহকে ‘জেহাদ’, আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। ‘চিতায় ওঠা’-র বদলে কথ্য বাংলায় ‘কবরে যাওয়া’ বা ‘কবর খোঁড়া’ কথাগুলোর প্রচলন বেশি বাড়ছে। এক পা, এক পা করে বাংলা তলিয়ে যাচ্ছে আরবিকরণের অতল গহ্বরে। এই পাঁচটা ধাপ যে সবসময় একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন, তা একেবারেই নয়। কখনো দুটো বা তিনটে ধাপ পাশাপাশিই চলেছে। কখনো আবার একটা পুরোপুরি শেষ হবার আগেই আরেকটি ধাপ চালু হয়ে গেছে। কিন্তু ধাপে ধাপে আরবিকরণ ক্রমাগত এগিয়েছে। কারণ এই বিপদ সম্বন্ধে হিন্দু বাঙ্গালির সচেতনতা ছিল না। ফলে এর গুরুত্বও উপলব্ধি করা যায়নি আর সংগঠিত প্রতিরোধও করা যায়নি। আরবিকরণকে রুখতে গেলে প্রথমেই দরকার বাংলার শুদ্ধিকরণ। অর্থাৎ যোগ্য বাংলা শব্দ খুঁজে, আরবি-ফার্সি যাবতীয় বিদেশি শব্দকে বাংলা ভাষা থেকে বহিষ্কার করা। এই প্রক্রিয়াতেই সনাতন বাংলা তার নিজস্ব চরিত্র আবার ফিরে পাবে। □

শিবশক্তি সেবা ধাম

বারাণসী, উত্তর প্রদেশ

হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভ মেলা ২০২১

শিবশক্তি সেবাধাম পরিচালিত প্রতি কুম্ভমেলার ন্যায় এবারও ২০২১শে হরিদ্বার, গঙ্গা-সংলগ্ন পোদ্দার ধর্মশালায় পাকাবাড়িতে থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। যারা যেতে চান 9451268600/ 7985210182 নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

ধন্যবাদান্তে

হৃষীকেশ মহারাজ

অধ্যক্ষ

জানা-অজানায় সারমেয়

কুকুরের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। আদিকাল থেকে গুহামানবরা তাদের নিরাপত্তার জন্য কুকুর পোষা শুরু করে। প্রভুভক্তিতে কুকুরের সমকক্ষ আর কোনো প্রাণীর নাম পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছে কুকুর হলো সবথেকে আদরের পোষ্য। কুকুরের বিভিন্ন নাম আছে, যেমন— সারমেয়, গৃহমৃগ, বক্রপুচ্ছ ইত্যাদি। ইংরেজিতে ডগ বলা হয়। কুকুরের প্রভুভক্তির পরিচয় আমরা মহাভারতেও পাই। যেমন অর্জুনের কুকুর একলব্যের ধনুর্বিদ্যা সাধনায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। মহাভারতে মহাপ্রস্থান পর্বে শেষ পর্যন্ত একটি কুকুর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হয়েছিল। নেকড়ের বংশধর কুকুর আধুনিক যুগেও পৃথিবীর সব থেকে প্রিয় পোষ্য। এরূপ প্রিয় পোষ্য কুকুর সম্পর্কে এবারের নবাঙ্কুরের পাতায় তোমাদের কিছু তথ্য জানাচ্ছি —

(১) মনে করা হয় কুকুর নেকড়ের পূর্বপুরুষ ছিল। এর কারণ আজ পর্যন্ত কুকুর ও নেকড়ের ডিএনএ-তে ৯৯.৯ শতাংশ মিল পাওয়া গেছে।

(২) কুকুরের রক্ত তেরো প্রকারের হয়ে থাকে, যেখানে মানুষের রক্ত মাত্র চার প্রকার।

(৩) দু'বছর বয়সের একটি কুকুর যে পরিমাম বুদ্ধিমান হয় তাতে ১৫০টি শব্দ বুঝতে পারে।

(৪) কুকুরের শুধুমাত্র নাক ও থাবা দিয়ে ঘাম বের হয়।

(৫) বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক কুকুরের নাম ছিল ম্যাগি, যা ত্রিশ বছর বয়সে মারা যায়। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৯৬ সালে জন্ম হয় ম্যাগির, আর ২০১৬ সালে মারা যায়।

(৬) প্রথম মহাকাশ যাত্রী হিসেবে ছিল একটি কুকুর। লাইকা নামের কুকুরটিকে ১৯৫৭ সালের ৩ নভেম্বর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে পাঠিয়েছিল। অত্যধিক চাপ ও তাপমাত্রার কারণে উৎক্ষেপণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যায় লাইকা।

(৭) কুকুরের ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে দশহাজার গুণ বেশি।

(৮) হিটলারের নাৎসিবাহিনী কুকুরকে কথা বলার প্রশিক্ষণ দেওয়া চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়।

(৯) কুকুর মানুষের মতো স্বপ্ন দেখতে পারে।

(১০) কুকুরকে চকোলেট খেতে দেওয়া উচিত নয়। চকোলেট ও কোকোতে থাকা 'ফিও ব্রোমিন' নামক উপাদান কুকুর সহজে হজম করতে পারে না। যা পরবর্তীতে টক্সিন তৈরি করে।

(১১) কুকুর পোষা আমেরিকার লোকেদের প্রিয় শখ। সেখানে প্রায় সাতকোটি পরিবারে কুকুর পোষা হয়।

(১২) কুকুর পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর পায়খানা, প্রস্রাব করতে পছন্দ করে। সত্যিই এই তথ্যটি বিস্ময়কর।

(১৩) পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে কুকুর আজ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরির কাজ করে চলেছে।

এরূপ প্রিয় পোষ্যটি কিন্তু রেগে গিয়ে কামড়ালে বা আঁচড় দিলে বিপদ ঘটতে পারে। কারণ কুকুর জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু 'রেবিস নিউরোট্রপিক ভাইরাস' বহন করে। কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে লালার মাধ্যমে মানুষ বা অন্য প্রাণীকে সংক্রামিত করে। জলাতঙ্ক রোগের জন্য প্রতি বছর বিশ্বে চব্বিশ থেকে ষাট হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে।

জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস সাধারণত কুকুরের কামড়ের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে এবং কামাড়ের স্থানেই জীবাণু বংশবৃদ্ধি করতে থাকে ও সংবেদী স্নায়ুকে আক্রান্ত করে। জীবাণু অ্যাক্সন বেয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দিকে এগোতে থাকে। সেখানে বংশবৃদ্ধি করে স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোনকে ধ্বংস করে থাকে। সঠিক সময়ে টিকা নিলে এই রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অজয় কুমার সাহা

ভারতের পথে পথে

ভাকরা বাঁধ

ভাকরা বাঁধ যদিও হিমাচল প্রদেশে, কিন্তু প্রবেশপথ এসেছে পঞ্জাবের উপর দিয়ে নাঙ্গাল হয়ে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ভাকরা শুধু বাঁধ নয়, জাগ্রত ভারতের মন্দির। চেহারাতেও যেমন বৈচিত্র্য, আকারো এটি অনন্য। ইংরেজি 'v' অক্ষরের মতো এই বাঁধটির উচ্চতা ২২৫.৫৫ মিটার। প্রস্থে ৫১৮. ১৬ মিটার। অর্থাৎ কলকাতার শহিদ মিনারের পাঁচগুণের মতো। ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি বিশ্বর বৃহত্তম ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প। বাঁধ তৈরি করতে যে পরিমাণ ইট ও সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়েছে তাতে সারা পৃথিবীতে ৮ ফুট চওড়া এক রাজপথ তৈরি হতে পারত। বাঁধে ওপর ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা তৈরি হয়েছে। নীচে বয়ে চলেছে শতদ্রু নদী। এই প্রকল্প থকে দিল্লি, পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থানের এক কোটি একর জমিতে সেচের জল যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ১০ লক্ষ কিলোওয়াট। ছাড়া বিধ্বংসী বন্যাও রোধ করা সম্ভব হযেছে এই বাঁধের কারণে।

জানো কি?

ভারতের উল্লেখযোগ্য নদীর উৎস মোহনা ও দৈর্ঘ্য

- ময়ুরাক্ষী–ত্রিকুট পাহাড়– গঙ্গা– ২৫০ কিমি।
- তিস্তা– হিমালয়– ব্রহ্মপুত্র– ৩১৫ কিমি।
- জলঢাকা– হিমালয়– ব্রহ্মপুত্র– ১৮৬ কিমি।
- তুঙ্গভদ্রা– পশ্চিমঘাট পর্বত– কৃষ্ণানদী– ৫৩১ কিমি
- শতদ্রু হিমালয়– সিন্ধুর উপনদী– ১৫০০ কিমি।
- ভীমা-- পশ্চিমঘাট– কৃষ্ণানদী–৮৬১কিমি।

ভালো কথা

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

মুম্বাইয়ের অন্ধেরির মিহির কামাত ও প্রিয়াংকা কামাতের মেয়ে তিরা। মাত্র পাঁচমাস বয়স। সে এক বিরল জেনেটিক রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য খরচ হবে ১৬ কোটি টাকা। মা-বাবার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। এত টাকা কোথায় পাবেন। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী সীতারামনের সঙ্গে কথা বলেন। বিভিন্ন অনুদান থেকে তারা ১৬ কোটি টাকা জোগাড় করেন। কিন্তু আমেরিকা থেকে ওষুধ আনতে আরও ৬ কোটি টাকা জিএসটি বাবদ দিতে হবে। সেই টাকা জোগাড় করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। একরত্তি শিশুর জীবন বাঁচানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজের উদ্যোগে মুকুব করে দিয়েছেন সম্পূর্ণ জিএসটি। খবরটি জানাজানি হওয়ার পর সবাই এমনকী বিরোধীপক্ষও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

সায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, একাদশ শ্রেণী, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ন ধা ব জী

(২) ত ন গ্র ব

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) তী স মা ন্ধ্যা ল

(২) না ন্ধ্যা ব স ন্দ

৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) অনুপ্রবেশ (২) আত্মপ্রকাশ

৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) হাস্যকৌতুক (২) সূর্যপ্রণাম

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিঃ। (২) আকাশ বাসফোর, খরমুজাঘাট, রায়গঞ্জ, উঃ দিঃ। (৩) সুকর্ণা দেব, গঙ্গারামপুর, দঃ দিঃ। (৪) রূপসা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। শ্রীগুরুজী ।। ৩ ।।

সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশের হাতিয়ার ছিল আর্যতত্ত্ব

আমরা যদি বাইবেলের অনুবাদ করে তার ইতিহাস নিজেদের মতো করে বোঝাতে যাই, খ্রিস্টানরা মেনে নেবে কি? আসলে হিন্দুরা হিন্দু ছাড়া সবাইকে বিশ্বাস করে এসেছে। আর নিজেদের নিম্নমানের ভেবে ঘৃণা করে এসেছে।

দেবযানী হালদার বসু

‘আর্যরা বহিরাগত আক্রমণকারী’ এই ভুল ইউরোপীয় তত্ত্বটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভব হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আর্য হলো ককেসীয় পার্বত্য অঞ্চল থেকে আসা গৌরবর্ণ, উন্নত নাসিকা, নীল চোখের মানুষ যারা খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতকে ভারত আক্রমণ করে। এরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতো। ঘোড়ায় টানা রথ এদের প্রধান যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। এরা লোহার ব্যবহার জানতো। এরা বেদ নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। সংস্কৃত এদের ভাষা ছিল।

এদের আক্রমণে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর উন্নত নগর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ আর্যরা লোহার ব্যবহার জানতো কিন্তু হরপ্পা সভ্যতার মানুষ তাম্র ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানলেও লোহার ব্যবহার জানতো না। হরপ্পা সভ্যতার মানুষের গায়ের রং কালো ছিল। এরা আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে বিন্ধ্যপর্বত পেরিয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে যায় এবং কালক্রমে এদের থেকেই দ্রাবিড় জনজাতির উৎপত্তি হয়।

এই আর্যরা আসলে যাযাবর জাতি ছিল। এরা নাগরিক নয় গ্রামীণ সভ্যতার সৃষ্টি করে যা হরপ্পা সভ্যতার থেকে অনুন্নত ছিল। এই আর্যরা ইউরোপ থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক অংশ ইরান বা পারস্যে যায়। একটি অংশ পশ্চিম ইউরোপে যায়। একটি অংশ দক্ষিণে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে। তাই সংস্কৃত, পার্সি ও ইউরোপীয় ভাষার আকারগত মিল খুঁজে

সিন্ধু সভ্যতায় রথ ও ঘোড়ার প্রমাণ।

ফ ঃ ৬

পাওয়া যায়। প্রাচীন এই ভাষার মিলের জন্য এদের এক ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে রাখা হয়, 'প্রোটো ইন্দো ইউরোপীয়' ভাষা গোষ্ঠী।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার এটি ছিল এক ঘৃণিত ষড়যন্ত্র। ইতিহাসের বিকৃতি করা হয়, সাহায্য হিসেবে বেদের ইংরেজি অনুবাদ করা হয় ও অর্থ সুবিধামতো করা হয়। তৎকালীন ভারতীয়দের অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা এবং বিদেশিদের উপর অন্ধ ভরসা এই কাজ সহজ করে দেয়। আসলে উপনিবেশ স্থাপনের মূল ভিত্তিই তো পরাজিত জাতিকে হেয় করা, তার সংস্কৃতিকে হেয় করা।

এই তত্ত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা প্রামাণিকতা ছিল না। কীভাবে এই তত্ত্ব সৃষ্টি হলো, এর পর সেটাই আলোচনা করবো।

আর্যরা বহিরাগত আক্রমণকারী এই তত্ত্বের উদ্ভাবক ইউরোপীয় পণ্ডিতরা :

'আর্যরা বহিরাগত আক্রমণকারী' এই তত্ত্ব প্রধানত Abbe Dubois এবং Max Muller-এর লেখায় বহুল প্রচলিত। Abbe Dubois-এর লেখা ফ্রেঞ্চ বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ 'Hindu Manners Customs And Ceremonies' (1897) —এই বইতে তিনি আরব ও মিশরের মানুষদের ভারতে আসার পরিবর্তে ককেসীয় অঞ্চলের মানুষের ভারতে আগমনের সপক্ষে বলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্সের এক ব্যবসায়ী Filippo Susseti প্রথম সংস্কৃত ও ইউরোপীয় প্রধান ভাষার সঙ্গে মিল খুঁজে পান। পরে ১৭৮৬ সালে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্যার উইলিয়াম জোন্স এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন। পরবর্তীকালে ভাষাতত্ত্ববিদ ম্যাক্স মুলার এই তত্ত্বকে আরও প্রামাণ্য করে তোলেন এই বলে যে সংস্কৃত, পার্সি, গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, গথিক ও কেলটিক— এই সাতটি ভাষাকে ইন্দো আর্য ভাষা বলা হয় এদের মধ্যে ভাষাগত মিলের জন্য। এদের 'প্রোটো ইন্দো ইউরোপীয়' ভাষা গোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করা হয় যার মধ্যে মাত্র দুটো ভাষা ইউরোপের বাইরের ভাষা। কাজেই ম্যাক্স মুলার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে যেহেতু এরা একটিই প্রাচীন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা, কাজেই তাদের পূর্বপুরুষ সবাই এক জায়গায় বসবাস করতো। আর মাত্র দুটো এশীয় ভাষা বলে ধরে নেওয়া হয় এদের আদি বাসস্থান ইউরোপ ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর্যদের খুব উন্নত বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় ১৯২০ সালে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা আবিষ্কারের পর। কারণ পুরাতাত্ত্বিক ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে হরপ্পা সভ্যতা অত্যন্ত উন্নত ছিল। তখন এই তত্ত্বকে বদলে দেওয়া হয়, আর্যদের যাযাবর জনজাতি বলে উল্লেখ করা হয়। কোনো তত্ত্বের প্রামাণিকতা বা বৈধতা ছিল না। হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারের পর নতুন আর এক ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু হলো। বলা হলো বহিরাগত আর্যরা উন্নত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নাগরিক কিন্তু অনুন্নত হরপ্পা সভ্যতাকে ধ্বংস করে। পরাজিত হরপ্পা সভ্যতার মানুষ তাদের আদি বাসভূমি ছেড়ে দক্ষিণে প্রস্থান করে এবং এই ভাবে কালক্রমে দ্রাবিড় জনজাতির উদ্ভব হয়। তাই এদের ভাষা, গোষ্ঠী আলাদা, গায়ের রং আলাদা, সংস্কৃতি ভিন্ন। এদেরকেই আর্যরা নিম্নবর্ণ শূদ্র বলে অভিহিত করে বেদে। এখানে এক সঙ্গে ভারতে দুই আলাদা জনজাতির উদ্ভব করা হলো, জাতিভেদের উৎপত্তি দেখানো হলো।

এই ইতিহাস বিকৃত করার পিছনে খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান বিরাট। বাইবেলের সময়পঞ্জী অনুসরণ করে এই তত্ত্ব তৈরি করা হয়। বাইবেল অনুযায়ী পৃথিবীতে সভ্যতার সূত্রপাত ৪০০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়ে হয়। বন্যার সময় ২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব বলে উল্লেখ করা আছে। তাই আর্যদের ভারতে আগমনের সময় ধরা হয় ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্ব নাগাদ। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ কেউ দিতেপারেনি। সবটাই নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনা।

এই তত্ত্বের উদ্ভাবনের পিছনে আসল কারণ ছিল, আর সেটা রাজনৈতিক। এর পরের পর্বে সেই কারণের খোঁজ করবো আমরা।

'আর্যরা বহিরাগত' এই তত্ত্বের উদ্ভাবনের কারণ :

'আর্যরা বহিরাগত' এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভাবে ইউরোপীয় মস্তিষ্ক প্রসূত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইউরোপীয়রা এসেই আগে ভারতীয় ভাষা শিখে নেয়। তারপর সব পুঁথি, মহাকাব্য পড়ে এবং এত বিস্তৃত, এত সভ্য সমাজের খোঁজ পেয়ে তারা বিস্মিত হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার দর্শন, বিজ্ঞান, আয়ুর্বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, স্থাপত্য বিজ্ঞান এতটাই উন্নত ছিল যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভাবনার বাইরে ছিল। কিন্তু অহংকারী শ্বেতাঙ্গরা মেনে নিতে পারেনি যে কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের থেকে উন্নত। তাই শুরু হলো ক্ষমতা ও বুদ্ধির অদ্ভুত নোংরা রাজনীতির খেলা।

বিখ্যাত French Philosopher Voltaire প্রায় ২০০ বছর আগে বলে গেছেন— 'I am convinced that everything has come down to us from the banks of the Ganges— astronomy, astrology, metempsychosis, etc.... It does not behove us, who were only savages and barbarians when these Indian and Chinese people were civilized and learned, to dispute their antiquity.'

আর্যদের এই জন্য ইউরোপীয়দের মতো দেখতে বলা হলো, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষার মিল দেখিয়ে ভারতীয়দের বোঝানো হলো যে বহু আগে আর্যরা এসেছিল আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ এসেছিল। দুজনেই একই রকম দেখতে, দুজনের ভাষার মূল ভাষাও এক। সেদিন আর্যরা তাদের সঙ্গে বেদ নিয়ে এসেছিল এবং আদি ভারতীয়দের শিক্ষিত করেছিল। ঠিক ব্রিটিশও তার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা এনেছে যা ভারতের সেই সময়ের শিক্ষার থেকে গুণমানে অনেক উন্নত।

এর সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে বিভাজনের নীতিও চালু হলো। উত্তর ভারতীয়দের সাদা আর্যদের বংশধর এবং কালো দক্ষিণ ভারতীয়দের আদি ভারতীয় বলা হলো। ভারতীয় জাতিকে আর্য ও দ্রাবিড়, দুই ভাগে ভাগ করে দিল। কোনো নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ দেওয়া হলো না। অবিশ্বাস ও ঘৃণার বীজ বোনা হয়ে গেল।

অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষা চালু হলো। কলকাতা ছিল সে সময় ব্রিটিশ রাজধানী। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলো। ভারতীয় প্রথাগত শিক্ষা উঠিয়ে ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতি শুরু হলো। এই সব শিক্ষা পদ্ধতি মূলত মিশনারি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলো। সনাতন হিন্দু ধর্মের কোনো ভালো দিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তুলে ধরা হলো না। হিন্দু ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন এটাই প্রচার হলো। ঠিক এই সময় ইউরোপীয়রা বেদ, মনুসংহিতার অনুবাদ করলো। সেখানেও অনেক অসত্য ও ভুল ব্যাখ্যা হলো। শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে গেল। যেহেতু বঙ্গে প্রথম ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়েছিল, বাঙ্গালি হিন্দুধর্ম বিমুখ হয়ে

গেল। স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দ ছাড়া অন্য কেউ হিন্দু ধর্মের হয়ে কথা বললেন না। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে গেল।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা যার ধর্ম অপরিবর্তিত আছে। আর তার ভিতরের সভ্যতা কেউ অনুভব না করে বিদেশি শিক্ষা পদ্ধতি যে উন্নততর, সবাই এক বাক্যে মেনে নিল। আর এই ভাবেই শুরু হলো দেশীয় সভ্যতার প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা। আর্যভট্ট, বরাহমিহির, সুশ্রুত, ধন্বন্তরি, কপিল মুনি, ঋষি গৌতম বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন। হিন্দুধর্মের মতের অন্য ধর্মের কথা বলা ফ্যাশন হয়ে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বলিদান হয়ে গেল আমাদের সভ্যতা আর আমরা নির্বিকারে সেটা মেনে নিলাম। এদিকে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ও দক্ষিণ ভারতে শুরু হলো অন্য খেলা। আর্যদের জন্য যে তারা তাদের বাসস্থান হারিয়েছে, সেটা মগজ ধোলাই করে ঢোকানো হলো। শুরু হলো মিশনারিদের ধর্মান্তরণ অভিযান।

ঋষি অরবিন্দ সঠিক মূল্যায়ন করেছিলেন যে ভারতে বহু পূর্বে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পূর্ণ ঐক্য ছিল যা হিমালয় পর্বত ও সমুদ্রের মাঝখানের ভূমিতে মানবতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা শিল্প বিপ্লবের তিনশো বছর পরেই শ্বাসরোধ হয়ে যাচ্ছে। এর কোনো দিশা, সুস্থ সীমা নেই, লোভ ও স্বার্থপরতা ছাড়া কিছু বেঁচে নেই। আর ভারত একাই এমন এক গভীরতর মূল্যবোধ সংরক্ষণ করে এসেছে যে মানুষ দেবত্বে উন্নীত হয়েছে। যেদিন আমরা ভারতের প্রাচীনত্ব বুঝতে পারবো, আমরা তার এত বছর ধরে বেঁচে থাকার শক্তি ও উৎস খুঁজে পাবো। এই ভাবেই ভারত বেঁচে থাকবে, এই অবক্ষয়ের মধ্যেও। আর ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বকে আবার পথ দেখাবে কিনা, সেটা একটা প্রশ্ন।

আর্যরা বহিরাগত আক্রমণকারী— একটি ভুল তত্ত্ব :

ড. আম্বেদকরের একটি উক্তি দিয়ে শুরু করছি।

'The theory of (Aryan) invasion is an invention. It's a perversion of scientific investigation, it is allowed to evolve out of facts.... It falls to the ground at every point. All available evidence shows that India's

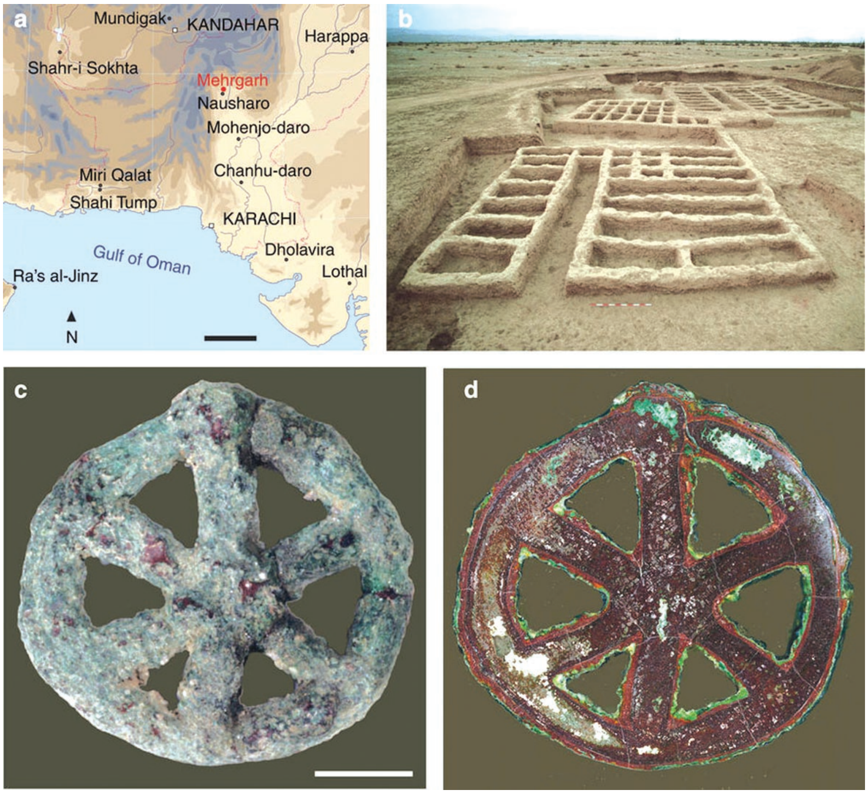

সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা চাকার ব্যবহার জানত।

civilization, whose roots go back even before the Harappan Civilization, grew on Indian soil. As the US Archaeologist Jim Shaffer puts it.'

১. আর্যরা ঘোড়ায় টানা রথে উত্তর পশ্চিম ভারতের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। সঙ্গে তাদের লোহার আধুনিক অস্ত্র ছিল। হরোপ্পা সভ্যতায় এই দুটোর কোনোটাই পাওয়া যায়নি বলা হয়।

এটি সম্পূর্ণ ভুল একটি ধারণা। এই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল কোনোভাবেই রথে করে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। পরবর্তী সময়ে খননকার্যে শুধু সিন্ধুসভ্যতা নয়, তারও আগের সময়েও ভারতে ঘোড়ার ব্যবহার হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধুসভ্যতার একটি সিলমোহরে চাকার চিহ্ন পাওয়া যায়। অর্থাৎ তারা চাকার ব্যবহার জানতো।

বেদে 'আয়াস' শব্দের মানে লোহা বলা হয়। যদিও জার্মান ও ল্যাটিনে 'আয়াস' শব্দের মানে ধাতব আকরিক। যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে বিভিন্ন রঙের আয়াস যেমন লাল, সবুজের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এটা একটি শব্দ যেটা সম্ভবত ধাতুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো।

ঋকবেদে আর্যদের শত্রুরাও 'আয়াস' তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের নগর তৈরি করেছিল। অর্থাৎ সেই হিসেবে সেই সময় লোহার ব্যবহার সবাই জানতো।

বালুচিস্তানের সীমান্তে খ্রিস্টপূর্ব ৩৬০০-তে ঘোড়ার নমুনা পাওয়া যায়। গুজরাট উপকূলে খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০-তে ঘোড়ার জিনের নমুনা পাওয়া যায়।

২. আর্যদের আক্রমণের সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়নি, সেটা এখন পুরাতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত সত্য। অভ্যন্তরীণ কারণ ও ভয়াবহ বন্যা ছিল ধ্বংসের কারণ। SR Rao এবং The national Institute of Oceanography-র খননকার্যে দ্বারকা ও বেট দ্বারকা দুই শহরের নমুনা পাওয়া গেছে যা সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার মধ্যবর্তী। সেখানেও কোনো বিদেশি প্রভাব দেখা যায়নি।

৩. সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম ও আর্য সভ্যতার ধর্ম আলাদা ছিল বলে Wheeler উল্লেখ করেন যিনি ধর্ম বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। তিনি সিন্ধু সভ্যতার মানুষ শৈব ছিলেন বলেন। গুজরাটের লোথাল, রাজস্থানের কালিবাঙ্গান অঞ্চলে বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী ব্যবহৃত পূজা ও যজ্ঞের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। অর্থাৎ ধর্ম

একই ছিল। শৈব ধর্ম বৈদিক ধর্মেরই একটি শাখা, সেটা আমরা সবাই জানি।

৪. সিন্ধু সভ্যতা সিন্ধু নদীর পশ্চিমে নয়, পূর্বে বিস্তৃত ছিল, সেটা পরবর্তী খননকার্যে প্রমাণিত। পঞ্জাব ও রাজস্থানের এইসব অঞ্চল প্রাচীন সরস্বতী নদীর ধারে ছিল। ঋকবেদে সরস্বতী নদীর সবচেয়ে বেশি উল্লেখ হয়েছে ও 'নদীমাতা' বলে অভিহিত হয়েছে। কাজেই সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতা যুক্ত ছিল। বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে সরস্বতী যা এক সময় বিশাল এক নদী ছিল তা লুপ্ত হয়ে যায় ১৫০০ খ্রিস্টপূবের আগেই। সেক্ষেত্রে ঋকবেদে সরস্বতীর উল্লেখ আশ্চর্যজনক, কারণ এই তত্ত্ব অনুযায়ী আর্যদের ভারতে আগমনের সময় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দী।

৫. ঋকবেদে বিভিন্ন নক্ষত্রের হিসেবে যে সময়ের হিসেব পাওয়া যায় তা খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০-এর। তারা সেই সময়েও জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী ছিল ও ভারতে বসবাস করতো।

৬. ঋক বেদের অনুবাদ করেন গ্রিফিথ ও তাতে বলেন যে আর্যরা সমুদ্র সম্বন্ধে অবগত ছিল। ১০০ বারের মতো 'সমুদ্র' শব্দ ব্যবহার হয়েছে, বহুবার জাহাজের উল্লেখ আছে, নদী যে সমুদ্রে মিশেছে তার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ আর্যরা খুব ভালো ভাবেই সমুদ্রের সঙ্গে পরিচিত ছিল। গ্রিফিথ সমুদ্রের মানে ocean লিখেও যখন অন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতরা বললেন যে আর্যরা সমুদ্র মানে বড়ো জলাশয় বা নদী অর্থে ব্যবহার করেছে, তিনি কিন্তু একবারো তাঁর নিজের লেখার উল্লেখ বা ব্যাখ্যা করেননি।

৭. সমগ্র ঋক বেদে আর্যদের আদি ভূমি হিসেবে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলকে বলা হয়। অন্য কোনো বিদেশি স্থানের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। বহিরাগত কোনো জাতির পক্ষে তার নিজের মাতৃভূমি এত সহজেই ভোলা সম্ভব নয়।

৮. আলেকজান্ডারের আগে ভারতে বড়ো রকম বহিরাগত আক্রমণকারী আসেনি। কোথাও তার কোনো প্রমাণ নেই।

৯. বৈদিক সংস্কৃতি যদি ভারতের বাইরের মানে ইউরোপীয় সংস্কৃতি হয়, তবে অন্য কোনো ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈদিক সংস্কৃতির ছাপ পাওয়া যেতো। তেমন কোনো প্রমাণ কিন্তু নেই। বৈদিক শ্লোক ভারত ছাড়া অন্য কোথাও উল্লেখ নেই।

১০. ঋকবেদে যে সমস্ত গাছপালার নাম পাওয়া যায়, সেগুলি উত্তরের ঠাণ্ডা অঞ্চলের নয়, বরঞ্চ ভারতীয় উপমহাদেশের।

১১. সংস্কৃত ভারতের বাইরের ভাষা নয়। ঋকবেদের বৈদিক সংস্কৃত বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়ে আজকের সংস্কৃত হয়েছে। ভারতের বাইরে অন্য কোথাও সংস্কৃতভাষার প্রয়োগ বা প্রচলন নেই। ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রমাণ করে না যে সংস্কৃত ইউরোপের ভাষা। ভাষা বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার উৎস দিয়ে জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি খোঁজা বৈজ্ঞানিক ভাবে সিদ্ধ নয়।

সংস্কৃত সব ভাষার জননী এটা প্রমাণিত। সব থেকে বেশি ব্যঞ্জন বর্ণের ব্যবহার সংস্কৃত ভাষায় দেখা যায়।

আর্য বহিরাগত নাহলে কারা এই আর্য?

আর্য কোনো জনগোষ্ঠী নয়। আর্য মানে 'ব্যবহারে যে মহান' তাকে আর্য বলা হতো। সাধারণত ক্ষত্রিয় রাজাদের আর্যপুত্র বলে সম্বোধন করা হতো। অনেকে আর্য মানে একটি উচ্চ পদকে বুঝিয়েছেন। ভারতের আদি নাম আর্যাবর্ত। ম্যাক্স মুলার আর্য বলতে ভাষাভিত্তিক শ্রেণী বুঝিয়েছেন, জনগোষ্ঠী হিসেবে নয়।

আর্য বলতে জীবনযাপনের শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিকে বোঝানো হয়েছে, বেশিরভাগ আধুনিক পণ্ডিত এই মতবাদ মেনে নিয়েছেন। তাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র আর্যদের বর্ণবিভাগ। 'অন্ত্যযশ' বলে একটি উপজাতিকে আর্য বলা হচ্ছে না, কারণ তারা আর্যদের এই জবিনযাপন পদ্ধতি মেনে চলতো না। অথর্ব বেদে অনার্যদের 'ব্রাত্য' বলা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের কোনো পুজোর রীতিনীতি ছিল না।

সমগ্র ঋকবেদে 'আর্য' শব্দটি কখনোই একটি জীবনগোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। যদি আর্যরা বিদেশি, আলাদা একটি জনগোষ্ঠী হতো, তবে তারা নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক আবদ্ধ রাখতো নিজেদের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে। কিন্তু আর্য অনার্যদের মধ্যে বিবাহ খুব সাধারণ ছিল।

বর্ণবিভাগ প্রথায় চারটি বর্ণ ছিল। বর্ণ এখানে জীবিকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু 'বর্ণ' মানে রং, তাই ইউরোপীয় পণ্ডিতরা রং অর্থে ব্যবহার করলো। দুটি বর্ণ বা রঙের কথা বলা হলো, সাদা ও কালো। প্রথম তিনটি বর্ণ সাদা ও শেষ বর্ণ কালো হয়ে গেল। আর ভারতীয়দের আসল রং বাদামি অনুল্লিখিত থেকে গেল। সব কিছু আরোপিত, কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। ঋকবেদে 'অনাস' বলে এক জাতির উল্লেখ আছে। 'অনাস' এর মানে 'নাক নেই' বলে ধরে নেওয়া হয়, কারণ আর্যরা 'উন্নত নাসা' ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত 'আনাস' মানে যারা ঠিক ভাবে কথা বলতে পারতো না।

আর্যরা যদি সাদা হতো তবে ভগবান বিষ্ণু, কৃষ্ণ কখনো কালো হতেন না। মহানায়ক অর্জুন কালো, দ্রৌপদীর আর এক নাম কৃষ্ণা মানে কালো। মহাভারতের মতো মহাকাব্যের রচয়িতা বেদব্যাস কুরূপ ছিলেন। তিনি অতি অবশ্যই কোনো সাদা সাহেব হতেন।

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালে ইউরোপ থেকে কোনো জনগোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করেনি। ওই সময় বড়ো কোনো অভিপ্রয়াণের কোনো প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রায় এক লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা থেকে ভূমধ্যসাগরে স্থানান্তরিত হবার প্রমাণ আছে। সেখান থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে তারা। কিন্তু এই প্রক্রিয়া আনুমানিক ৬০০০০ বছর আগে হয় এবং তারপরে আর কোনো জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ভারতে ঘটেনি। আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন জনগাষ্ঠীর সমন্বয়ে এক পৃথক ভারতীয় জনগোষ্ঠীর উন্মেষ ঘটে। নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে যাতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে ৬০০০০ বছরে ভারতে অন্য কোনো বড়ো মাপের বহিরাগত জনগোষ্ঠী আসেনি। নৃতত্ত্ববিদ ড. বি এস গুহ প্রাগৈতিহাসিক মানব কঙ্কাল ও আজকের কঙ্কাল গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে ভারতীয় জাতিতে মোট ছয় রকম জাতির মিশ্রণ ঘটেছে।

1. Negrito, 2. Proto-Australoid, 3. Mongoloid, 4. Mediterranean, 5. Western Brachycephate, 6. Nordic.

পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে খুব বড় সংখ্যায় মানুষ স্থানান্তরিত হয়ে ইউরোপে চলে যায়। আর তাই ভাষাগত সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ইউরোপের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার অবদান বলা যেতে পারে।

'বৈদিক সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতার পরবর্তী পর্যায়'

আর্যরা যদি বাইরে থেকে না আসে তাহলে এরা কারা? আর কোথা থেকেই বা এলো? আর্যরা কোথাও থেকে আসেনি। বিগত প্রায় ৬০০০০ বছর ধরে তারা ভারতীয় উপমহাদেশেই বসবাস করছিল প্রাগৈতিহাসিক

যুগ থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তারা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতা তৈরি করেছিল, সেটা হলো সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা।

হরপ্পা সভ্যতার অনেক ধ্বংসাবশেষ বিগত কয়েক বছরে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খনন কার্যের ফলে পাওয়া গেছে। প্রতিটা শহরের ডিজাইন, প্ল্যানিং, লে আউট সব এক। এক রকম নিকাশী ব্যবস্থা, খাদ্যশস্য ভাণ্ডার, স্নানাগার, বড়ো বড়ো প্রাসাদ, সব শহরেই পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ সালে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে হরপ্পার বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া গেছে। হরপ্পার সিলমোহর, গয়নার যে রকম নমুনা পাওয়া গেছে, একে তাই কোনো বিচ্ছিন্ন সভ্যতা না বলে এক সুশাসিত সাম্রাজ্য বলা উচিত হবে। সাম্রাজ্য অর্থাৎ কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠিত শক্তিশালী শাসক ছাড়া এত নিয়ম মেনে সব কিছু করা সম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে এমন এক সাম্রাজ্য এক যাযাবর গোষ্ঠীর হঠাৎ আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল, সেটা অসম্ভব।

হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংস প্রধানত জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য হয়েছিল। মহেঞ্জোদারো শহরেই ৩ বার ভীষণ বন্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যদিও মহেঞ্জোদারো অনেক উঁচুতে অবস্থিত ছিল। কিন্তু নীচু জায়গা সব সম্পূর্ণ রূপে জলের তলায় জলে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল, আর সেই সব জায়গার খোঁজ এখন পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই পালিয়ে যাওয়া ছাড়া নাগরিকদের কাছে আর কোনো উপায় ছিল না। গুজরাটের লোথাল একটা বড়ো বন্দর শহর ছিল। জল দিয়ে ঘিরে যেখানে নোঙ্গর ফেলা হতো, আজো একই রকম আছে। বড়োসড়ো কোনো আক্রমণ হলে সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো। এখনো পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতার কোনো জায়গায় আক্রমণের কোনো চিহ্ন নেই। কাজেই বন্যা ছাড়া ধ্বংসের অন্য কারণ ছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন না।

সরস্বতী নদী খুব বিশাল ছিল যা শুকিয়ে যায়। সিন্ধু নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে। এদের প্রকৃত কারণ এখনো অজানা। এইসব জায়গার মাটি লবণাক্ত হয়ে যায়। রাজস্থান মরুভূমিতে পরিণত হয়। সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাবার পর মানুষ পূর্বে সরে আসে গঙ্গা-যমুনা অববাহিকায়। পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় এই সময় পশ্চিম থেকে পূর্বে সরে আসার। খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০-এর পরে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে আর কোনো বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় যে শাসন ছিল তা দুর্বল হয়ে যায়। অর্থনীতিও ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষ কর্মহীন হয়ে যায়। পরবর্তীকালের হরপ্পা শহরে আগের মতো নগর পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায়নি। বড়ো বড়ো বাড়ির বদলে ছোটো ছোটো বাড়ি পাওয়া যায়। শিল্পের অবনতি, নিকাশী ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রশাসন দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। বড়ো শহর বন্যায় ধ্বংস হয়ে গেল। ছোটো শহরে মানুষের ভিড় বেড়ে গেল। কাজের অভাব, খাদ্যের অভাব হলো, কারণ জমি সব অনুর্বর হয়ে যায় বন্যার জন্য। কাজেই মানুষ উর্বর জমির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো।

১৯৯৫ থেকে ৯৮ সালে মেহেরগড়, নৌশারো ও পিরাকে ব্যাপক খননকার্য চলে। এই জায়গাগুলো প্রমাণ করে যে উন্নত শহুরে হরপ্পা সভ্যতা থেকে কীভাবে গ্রাম্য সভ্যতায় পরিণত হলো। খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ সাল এই জন্য পরবর্তী হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়।

নাগরিক মানুষ অবস্থার বিপাকে পড়ে গ্রামীণ হয়ে গেলেও সংস্কৃতি কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় না। রীতিনীতি হারিয়ে যায় না। ধীরে ধীরে শুধু বিবর্তন হয়েছে মাত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। হরপ্পা সভ্যতার ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতি গুপ্ত যুগেও পাওয়া যায়। বর্তমানে আমরা যে জগ, গোরু বা পশু টানা গাড়ির অংশ, চিরুনি ব্যবহার করি, সেগুলো হরপ্পা সভ্যতার সময়েও ব্যবহৃত হতো।

১৭৯০ সালে জন প্লেফেয়ার একটি হিসাব কষে বলেন যে হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানের শুরু খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০০-তে। বৈজ্ঞানিক ভাবে এই তথ্যের বিরোধিতা কেউ করেনি। কিন্তু বেন্টলে যে অযৌক্তিক অবান্তর কারণ দেখান, সেটা সম্পূর্ণ ধর্মীয় গোঁড়ামি। যেহেতু খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-এর আগের সময় বাইবেলের সময়পঞ্জী বহির্ভূত, তাই ব্যাখ্যা হলো না।

আসলে ঋক বৈদিক সাহিত্য অনুযায়ী এই অঞ্চলে কোনো বহিরাগত আক্রমণকারী আসেনি। বরঞ্চ বলা যায় যে দেশীয় সভ্যতার মৌলিক পুনর্গঠন হয়েছিল মাত্র।

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যে ঋকবেদের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ ধরেছিলেন, সেটাও কিন্তু গোড়াতেই ভুল হয়েছে। কারণ বেদ 'শ্রুতি'। অর্থাৎ বহু বছর ধরে প্রচলিত এই বেদ যা মানুষ শুনে মনে রেখে এসেছে। সেক্ষেত্রে কথ্য ভাষার পরিবর্তন হলেও শ্রুতি কিন্তু অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা বেশি। অনেকে হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে যজুর্বেদের মিল খুঁজে পেয়েছেন। আর ঋক বেদ হয়তো তার আগের সভ্যতায় তৈরি হয়েছিল, যখন সরস্বতী নদী প্রধান নদী ছিল।

আর ঠিক এখানেই শুরু হলো সব সমস্যার সূত্রপাত। কারণ ঋক বেদ ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য পড়লে বোঝা যায় যে ভারতীয় সভ্যতা কতটা প্রাচীন। ভারতীয় সভ্যতা আসলে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। ইউরোপীয় সভ্যতা, সাহিত্য, বিজ্ঞানী ভারতীয় সভ্যতার কাছে নিতান্তই শিশু হয়ে গেল। কাজেই শুরু হলো কাটাছেঁড়া। অবৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল বৈদিক সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার অবদান। ভারতীয় ভাষা ইউরোপীয় ভাষা থেকে সৃষ্ট। ভারতীয় বিজ্ঞান, দর্শন গ্রিসের বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে আমরা, ভারতীয়রা এই তত্ত্ব আজও বিশ্বাস করি। আজো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস পড়ানো হয়, তাদের অনুবাদ করা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়ানো হয়।

ভারতবর্ষ আজও তাদের ইতিহাসে ইউরোপীয় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন করেনি। দয়ানন্দ সরস্বতী, ঋষি অরবিন্দ বা বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া সেই সময় এর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলেনি। আজও তথাকথিত বামপন্থী ঐতিহাসিকরা প্রচার করে যে আর্যরা বহিরাগত আক্রমণকারী এবং তারা ইউরোপীয় বংশধর।

এখনো খ্রিস্টান মিশনারিদের করা বেদের অনুবাদের উপর নির্ভর করে আমরা কথা বলি যেমন ম্যাক্স মুলার, গ্রিফিথ, মনিয়ের উইলিয়ামস, এইচ এইচ উইলসন ইত্যাদি। আজ যদি আমরা বাইবেলের অনুবাদ করে তার ইতিহাস নিজেদের মতো করে বোঝাতে যাই, খ্রিস্টানরা মেনে নেবে কি? আসলে হিন্দুরা হিন্দু ছাড়া সবাইকে বিশ্বাস করে এসেছে। আর নিজেদের নিম্নমানের ভেবে ঘৃণা করে এসেছে। পরিণতি ভোগ তো করতেই হবে যতক্ষণ না স্বীয় মহিমান্বিত হয়ে সদর্পে নিজের আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। □

স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের উদ্যোগে মেন্দি বাজার শেড নির্মাণ চিত্র

Achivment of Kailashahar Dist. H/Q ICDS Project, Unakoti Tripura

Name of schme/project	Name of work/activit	Unit	2018-19 phy	2019-20 phy	2020-21 phy
ICDS	SNP Provided (Children)	14988	4990	4994	5004
ICDS	SNP Provided (PM,NM)	2885	960	945	980
Social Security Pension	One time Pension	144	0	144	0
NSAP	NFBS	3	0	0	3
NSAP	Ex-gratia given to Social Security Pensioners due to COVID-19	2082	0	2082	0
Maternity benefit scheme	PMMVY	997	636	217	144
ICPS	Sponsorship Grant	7	0	7	0
POSNAH ABHIYAB/NNM	CBE Conducted under POSNAH BHIYAN	2250	750	1250	250
ICDS	LPG Connectivity to AWCs	15	0	0	15
ICDS	Toilet Repair	22	0	0	22
ICDS	DWS Connectivity to AWCs	15	0	0	15
ICDS	AWC Building Repairing	125	0	125	0
Social Security Pension	Enhance amount to Social Security Pension State & Central Scheme @Rs.300/-Per Benef.	5328	0	5328	0

Advt.

শব্দরূপ-৭ (বিষয় অভিমুখ ইতিহাস) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

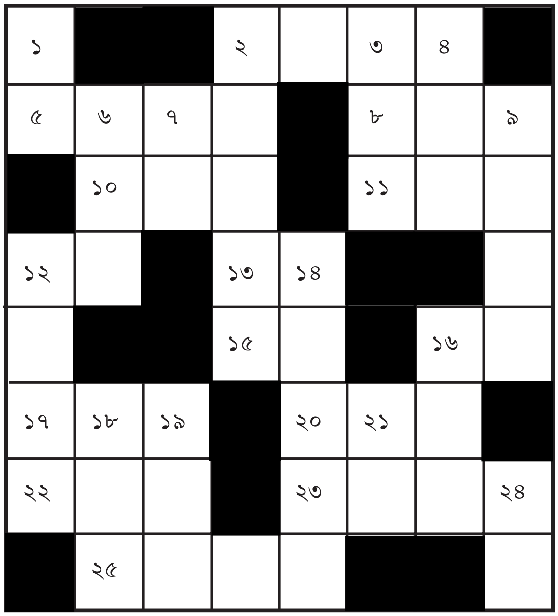

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. যে দণ্ডনীয় হয়ে আছে।
৫. পাল-রাজত্বকালের শেষের দিকের এক রাজা।
৮. সম্মানিত। **১০.** গৌরব...গুরুত্ব।
১১. দৃষ্টি, মনোযোগ।
১২. হত্যা, নিধন।
১৩. সমূহ, সম্প্রদায়।
১৫. শত সহস্র।
১৬. পানীয়—অর্থাৎ জল।
১৭. সুর, অধিপতি।
২০. মুসলমান রাজা।
২২. বৃহৎ নগর।
২৩. দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডারের সেনাপতি।
২৫. আকবরের সভায় সুরসাধক।

উপর-নীচ : ১. 'মৌর্য' নামটি নাকি এই রমণীর নামে!
২. বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কামান। **৩.** পালযুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর।
৪. অন্যতম পর্তুগিজ পর্যটক, যার বর্ণনা থেকে বিজয়নগর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যায়। **৬.** সম্রাট আশোকের রাজ্য।
৭. নৌকাপথ। **৯.** কলহনের লেখা— 'রাজ—'।
১২. উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীন রাজ্য, গৌড়।
১৪. সেন বংশের এক শাসক রাজা।
১৬. অগ্নি, যা পবিত্র করে।
১৮. যা প্রবাহিত অবস্থায় আছে।
১৯. যা উদ্ধার করে। **২১.** বালুকা (সংক্ষেপে)।
২৪. সাধু, মহাত্মা।

(● আগামী সংখ্যায় সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।)

প্রেরণার পাথেয়

সঙ্ঘের প্রত্যেক স্বয়ংসেবক আকর্ষণের কেন্দ্র হইতে হইবে। কিছু লোককে সব সময়ে নিজের কাছে আকর্ষিত করিয়া রাখার ক্ষমতা তাহার থাকা চাই। কোনো না কোনো গুণ তাহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় থাকা চাই। যাহার কথায় মিষ্টতা আছে, পরিস্থিতি বুঝিবার মতো ক্ষমতা যাহার আছে এবং কাহার দ্বারা কী কাজ হইতে পারে তাহা বুঝিয়া সেই অনুযায়ী উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, সেই ব্যক্তিই সংগঠন করিতে পারে।

* * *

প্রত্যেকের ইহা চিন্তা করা উচিত যে আমি সঙ্ঘের কাজ কতটা এবং কীভাবে করিতেছি। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা উচিত। কিছু না বুঝিয়া যেমন তেমন ভাবে কোনো কাজ করা ঠিক নয়।

* * *

সঙ্ঘের কাজ সংখ্যা-বৃদ্ধি ও গুণ-নির্মাণ এই দুইটি দিক দিয়া হওয়া উচিত। সংখ্যা বাড়ানো সব সময়েই প্রয়োজন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চিন্তা করা দরকার যে সেই স্বয়ংসেবকরা আদর্শনিষ্ঠ কী করিয়া হইবে। যে স্বয়ংসেবক নূতন তাহার মধ্যে আদর্শনিষ্ঠা উৎপন্ন করিতে হইবে। এবং পুরাতনদের আদর্শনিষ্ঠাকে অধিকতর উজ্জ্বল করিতে হইবে। ইহা প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের কাজ।

* * *

যদি ভুল করিয়া তোমার বন্ধুকেও দোষী বলিয়া ধরা হয় তবে তাহার পক্ষ লইতে যাইও না। যদি বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা এবং সঙ্ঘের প্রতি ভালোবাসার মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হয় তাহা হইলে মনে রাখা উচিত যে প্রথমে সঙ্ঘ পরে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি। সঙ্ঘের জন্য যে কোনো প্রকার সুখকে যদি অগ্রাহ্য করিতে হয় তবে অসংকোচে তাহা করিবে। সঙ্ঘে আলাদা আলাদা দলের সৃষ্টি করিও না। সমস্ত সংগঠন, এমনকী নিজেদের বাঁচা-মরা সব কিছুই ইহার জন্য— এই কথা মনে রাখিয়া তোমার কাজ করা উচিত।

* * *

নিষ্ক্রিয়তাকে আমরা একটু গুণ বলিয়া মনে করিতে শুরু করিয়াছি। যে সব সময় চুপ করিয়া থাকে লোকে তাহাকে বড়ো ভালোলোক বলিয়া মনে করে। ভালোলোক কাহাকে বলে? আজকালকার মতে সেই ভালোলোক যে কোনো ঝামেলায় যায় না, স্নানের পরে ভোজন করে, তাহার পর অফিস কিংবা দোকানে যায়, তাহার পর পুনরায় ভোজন করিয়া শুইয়া পড়ে। লোকে বলা-বলি করে 'দেখুন তো গোবিন্দদাসজী কত ভালো লোক, কত শান্ত, কত সাদাসিধা। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এই পাড়ায় বাস করিতেছেন কিন্তু কেউ জানিতেই পারে না যে তিনি এখানে আছেন। এত ভালোলোক সত্যই বিরল।' কিন্তু আমাদের এইরূপ ভালোলোকের প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি চুপচাপ অত্যাচার সহ্য করে সে যদি ভালোলোক হয় এবং এইরূপ ভালোলোক যদি প্রচুর সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় তবে হিন্দু সমাজ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে না। এবং কখনই উন্নতি করিতে পারিবে না।

('ডাক্তারজীর বাণী' পুস্তিকা থেকে গৃহীত)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

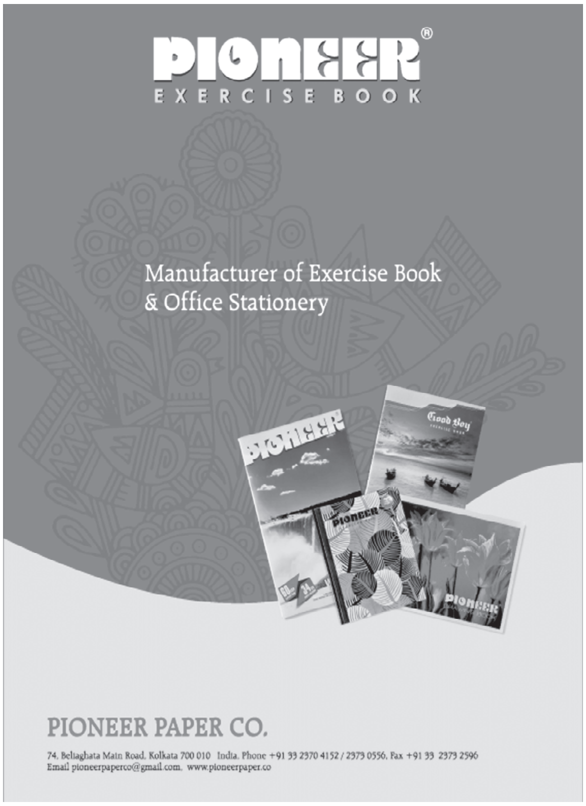

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫